শনিবারের চিঠি

১৪ পৌষ ১৩৯১ □ ২৯ ডিসেম্বর ১৯৮৪

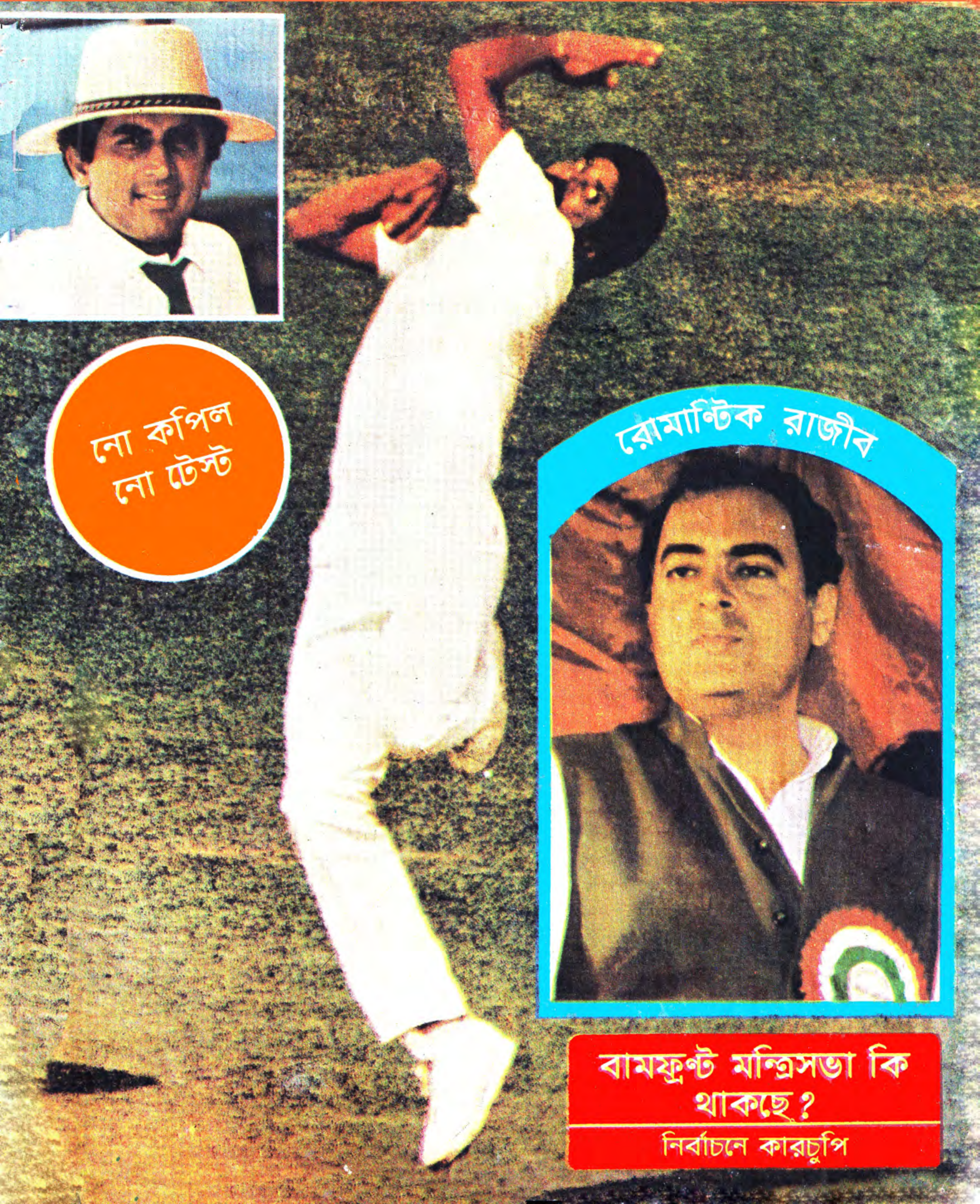

নো কপিল
নো টেস্ট

রোমান্টিক রাজীব

বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভা কি থাকছে?

নির্বাচনে কারচুপি

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ সুজিত কুণ্ডু

স্ক্যান ঃ রূপালী গোসাভি

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

আমাদের প্রকাশিত চিরায়ত গ্রন্থরাজি

* রচনাবলী – মানিক গ্রন্থাবলী (১৩ খণ্ডে সমাপ্ত)।। বনফুল রচনাবলী (১৯ খণ্ড প্রকাশিত)।। বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ (৯ খণ্ড প্রকাশিত)।। অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী (১০ খণ্ড প্রকাশিত)।। নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনাবলী (৪ খণ্ড প্রকাশিত)।। প্রেমেন্দ্র মিত্র রচনাবলী (২ খণ্ড প্রকাশিত)।। জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী (২ খণ্ড প্রকাশিত)।।

প্রতি খণ্ডের মূল্য ৩০ টাকা। তালিকাভূক্ত গ্রাহকদের জন্য বিশেষ সুবিধা রয়েছে।

* বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবণের গবেষণা গ্রন্থ–অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত রবীন্দ্র–রচনা সংকলন –
রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তা–২৫ টাকা। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য চিন্তা–৩০ টাকা

* রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগত।। অধ্যাপক সতেন্দ্রনাথ রায়।। ৩০ টাকা
রবীন্দ্র স্মৃতি।। বনফুল।। ১০ টাকা

* অধ্যাপক ড: সরোজমোহন মিত্রের–মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবন ও সাহিত্য।। ৩০ টাকা
সুকান্তের জীবন ও কাব্য।। ১৫ টাকা শরৎসাহিত্যে সমাজচেতনা।। ১৬ টাকা

* উপন্যাস –বনফুল হাটেবাজারে ৮ টাকা।। গোপালদেবের স্বপ্ন ১০ টাকা।। অধিক লাল ১০ টাকা।। ত্রিনয়ন ৮ টাকা।। গল্পসমগ্র (দুই খণ্ড প্রকাশিত) প্রতি খণ্ড ৩০ টাকা।। পশ্চাৎপট (আত্মজীবনী) ২৫ টাকা।।
–বুদ্ধদেব বসু বাসর ঘর ১০ টাকা।। লাল মেঘ ১০ টাকা।। কালো হাওয়া ১৫ টাকা।। এলোমেলো জলতরঙ্গ (ছোটদের উপন্যাস) ১০ টাকা।।
–প্রতিভা বসু : জন্মান্তর ১০ টাকা।। যখন বসন্ত ১০ টাকা।। স্মৃতি সততই সুখের।। (আমেরিকা ও ইউরোপের বিচিত্র ভ্রমন কাহিনী–দুই খন্ডে। প্রতি খণ্ড ২০ টাকা এবং ৩০ টাকা।।
–জগদীশ গুপ্ত : লঘুগুরু ও অসাধু সিদ্ধার্থ ১০ টাকা।।
–নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : পদসঞ্চার ১২ টাকা।।
–শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জনপদবধূ ১২ টাকা।। কর্ণাটরাগ ৮ টাকা।। নগরনন্দিনীর রূপকথা ১০ টাকা।।
–নিরঞ্জন চক্রবর্তী : খেলাঘরের যাত্রী ৮ টাকা।। প্রতিবিম্বের স্বাদ ৮ টাকা।।

* কবিতা –অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : উত্তরায়ণ ১০ টাকা।। নীল আকাশ ৮ টাকা।। পূব পশ্চিম ৮ টাকা।। আজন্ম সুরভী ৮ টাকা।।
–বুদ্ধদেব বসু শীতের প্রার্থনা–বসন্তের উত্তর ১০ টাকা।। যে আঁধার আলোর অধিক ৮ টাকা।। মরচে পড়া পেরেকের গান ৮ টাকা।।
–জীবনানন্দ দাস : আলো পৃথিবী ১০ টাকা।।
–মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : সমগ্র কবিতা ১০ টাকা।।

গ্রন্থালয় প্রা. লি. – ১১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট।। কলিকাতা-৭৩

গাভাসকার–কপিল বিরোধঃ অজয় বসু, বরুণ বর্মন এবং সৌমিত্র ঘোষ দস্তিদারের প্রতিবেদন।

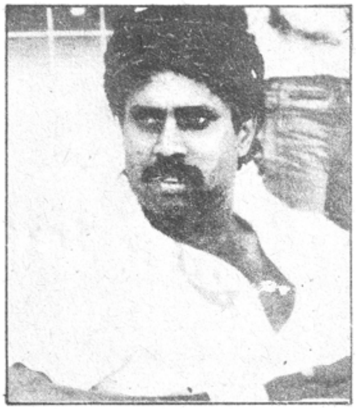

দিল্লি এবং আমেথির মত রাত্রির কলকাতাকে রাজীব দেখতে চেয়েছিলেন। একাকী মোটর চালিয়ে শহর প্রদক্ষিণের ইচ্ছে তাঁর বাতিল করতে হয় রাজ্যপাল দীক্ষিতের আপত্তিতে। 'রোমান্টিক রাজীব–'এ নতুন প্রধানমন্ত্রীকে চেনা যাবে।

বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভার আয়ু কি ফুরিয়ে এসেছে? বিরোধীদের তৈরি অস্ত্রেই কি রাজীব বসু মন্ত্রিসভা ফেলে দেবেন? আমাদের বিশেষ প্রতিনিধির প্রতিবেদন।

রঙীন ফাঁসঃ তারাশঙ্করের প্রথম জীবনের একটি দুষ্প্রাপ্য গল্প যা কোন পুস্তকে পাওয়া যাবে না।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় –
মরজি মহল □
নূপুরের মতো □ অনুলিখন অনুপমা দাশ
ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্র □ ডঃ নন্দগোপাল ভট্টাচার্য
বাংলা ছবি বিপাকে □ মৃদুল বন্দ্যোপাধ্যায়
অর্থনীতি ও সাহিত্য □ অলোক চট্টোপাধ্যায়
রঙীন ফাঁস □ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
সমাজ বিরোধীদের মুক্তাঞ্চল □ বিমান মুখোপাধ্যায়
বিধিবন্ধ রেশনিং থেকে মুক্তি চাই □
রোমান্টিক রাজীব □ অজিত চক্রবর্তী
বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভা কি থাকছে? □
নির্বাচনে দুর্নীতি, দলবাজি □
কপিল বনাম গাভাসকর □ অজয় বসু
নির্বাচনের খরচ □ অমিত রায়
আকাশ দর্শন বনাম দূরবাণী □
বাংলাদেশের ভিতরে □
সংবাদ বিসংবাদ □
ঘাবড়াও মৎ, কপিল □ বরুণ বর্মন
নো কপিল, নো টেস্ট □ সৌমিত্র ঘোষ দস্তিদার
এ রাজ্যে কংগ্রেস ভাঙছে না কেন □
আগুন নিয়ে খেলা □ অভীক রায়
বাংলাদেশে নির্বাচন বৈশাখেই □ পরেশ সাহা
রক্ত দিয়ে শুরু রক্ত দিয়ে শেষ □ ধীরানন্দ রায়
স্মাগলারদের মধুচক্রে □
ময়না তদন্ত □ বিশ্বজিৎ রায়
নির্বাচনে কারচুপি □
সংবাদ সাহিত্য □

প্রচ্ছদের ছবি □ অমিয় তরফদার
অন্যান্য ছবি □ অনীলবরণ, চণ্ডী ঘোষ, দিলীপ ঘোষ, প্রবীর দাস, কবীর আইচ, অমিত ঘোষ

পরবর্তী সংখ্যায়

প্রচ্ছদ কাহিনীঃ

সত্যজিৎ রায় ও ঘরে বাইরে

শংকর ঘোষ ও অরুণ বাগচীর প্রতিবেদন

এক মৃত ব্যক্তি বাংলাদেশ শাসন করছেন □ ইন্দিরা হত্যার ষড়যন্ত্রের নায়ক কলকাতায় কি করছিলেন □ ছোট গল্প □ কার্টুন। □

শনিবারের চিঠি

(প্রথম প্রকাশ ১৩৩১ বঙ্গাব্দ)

(নব পর্যায়) ১ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা

৭ পৌষ, ১৩৯১ □ ২২ ডিসেম্বর, ১৯৮৪

সম্পাদক: চিরন্তন মুখোপাধ্যায়

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা: সাহিত্য ● রঞ্জনকুমার দাস, সংবাদ ● অজিত চক্রবর্তী

ব্যবস্থাপক: অরুণাংশু ঘোষ

প্রধান কর্মসচিব: শ্যামলী মুখোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদক: রাঘব বন্দোপাধ্যায়

অলংকরণ ও অঙ্গসজ্জা: আশিস মুখোপাধ্যায়

মুদ্রণ: শহীদুল ইসলাম

বনফুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে চিরন্তন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক কম্প্যু কম্পোজিং অ্যান্ড পিন্টিং (ক্যালকাটা) প্রাইভেট লিমিটেড ৯৬ রাজা রামমোহন সরণি কলিকাতা–৯ থেকে মুদ্রিত ও ৩২, গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ কলিকাতা-৭০০০১৩ থেকে প্রকাশিত।

কার্যালয় ৩২, গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ কলিকাতা–৭০০০১৩ ফোন ২৭-৪৯৪৩

দিল্লি অফিস সুনীল ভবন সি ১/১০১–১০২ লাজপত নগর নয়া দিল্লি–১১০০২৪ ফোন: ৬১৭৬৭১

ত্রিপুরা প্রতিনিধি: গোপাল বসু

WITH BEST
COMPLIMENTS
FROM

A WELL WISHER

জনগণই শ্রেষ্ঠাংশে

নির্বাচনও একটা ঝড়। এই ঝড়েও বাতাস বয়, তবে দেখা যায় না, অনুভব করাও যায় না। জানা যায় অনেক পরে। ফল বেরিয়ে যাবার পর। এবারও ঝড়ের গতি কোন দিকে ছিল তার আভাস পাওয়া গেল ২৮ ডিসেম্বর মধ্যরাত্রে। ১৯৭২, '৭৭ এবং '৮০তে ঝড়ের গতি-প্রকৃতি দেখে তার নামকরণ হয়েছিল যথাক্রমে ইন্দিরা হাওয়া, জনতা হাওয়া, ইন্দিরা হাওয়া। ইংরেজিতে বলা হয় ওয়েভ -- হাওয়া কিছুতেই তার জুতসই বাংলা নয়। কিন্তু চলছে।

ফল প্রকাশিত হবার পর উপলব্ধি করা যায় যে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা একই হাওয়া বয়েছে। এ হাওয়ার ক্ষেত্র মানুষের মন, তাই কোন গণৎকার, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক -- এমনকি আবহাওয়াবিদের পক্ষেও পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব নয়। ১৯৭৭-এ ইন্দিরার পতন হবে -- এ কথা কেউ আঁচ করতে পারেননি। ইন্দিরাও না।

পশ্চিমবাংলায় পূর্বাভাস দেওয়া আরও কঠিন। কারণ এখানে লড়াই শুধু কংগ্রেস আর সি পি এম-এ নয়। লড়াই কো-অর্ডিনেশন আর ফেডারেশনেও। এ লড়াইয়ে ভিড়ে গেছেন পুলিশ অ্যাসোসিয়েশন এবং নন গেজেটেড পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনও। কলকাতায় কলকাতা পুলিশ অ্যাসোসিয়েশন এবং কলকাতা পুলিশ অর্গানাইজেশনও বসে নেই। সরকারি কর্মচারী এবং পুলিশ কখনও এইরকম প্রকাশ্যে নির্বাচনী প্রচারে অংশ নেননি। এ রাজ্যে যে এত ভোটার বাদ পড়লেন তার হেতুও এই সরকারি কর্মচারীরাই। তাঁরাই দাদাদের দুষ্টবুদ্ধি দিয়ে শত্রুপক্ষের ভোটারদের নাম কাটতে আর নিজেদের মৃত, অনুপস্থিত এবং অপ্রাপ্তবয়স্কদের তালিকায় নাম তুলতে উৎসাহিত করেন। যে রাজ্যে পুলিশ এবং প্রশাসনে উৎকট রাজনীতি ভীষণভাবে ঢুকে পড়েছে, যেখানে ভোটের কর্মী হিসেবে শুধুমাত্র কো-অর্ডিনেশনপন্থীদেরই বেছে নেওয়া হয়, সেখানে ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকসন এবং বিশুদ্ধ ভোটগণনা কি করে সম্ভব?

সন্দেহ নেই যে, অপ্রস্তুত কংগ্রেস এবার নির্বাচনী লড়াইয়ে সি পি এম-কে ফারসট রাউন্ডে ওয়াক ওভার দিয়েছে। দ্বিতীয় রাউন্ডে কংগ্রেস নেতা ও কর্মীদের রাজনৈতিক ঘুম না ভাঙলেও সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে তরুণেরা তাঁদের ঠেলে ঠুলে কাজে নামিয়েছেন। নেতারা তাঁদের বাবুদের কেন্দ্রে চুপিসাড়ে সরে পড়ায়, নতুন কর্মীরা পড়েছেন অসুবিধেয়। পুঁজি বলতে শুধু তারুণ্য আর উদ্যম। অভিজ্ঞ ক্যাডারদের সঙ্গে এই পুঁজি নিয়ে সংখ্যায় অনেক বেশি হলেও লড়াই করা কি সহজ?

এ রাজ্যে নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য হল বহু কেন্দ্রে কংগ্রেসের বিক্ষুব্ধ নেতাদের গোপন বিদ্রোহ আঁচড় কাটতে পারেনি। একই কথা বলা চলে ফ্রন্টের বিক্ষুব্ধ নেতা ও গোষ্ঠী সম্পর্কে। এ রাজ্যের মানুষ দেখিয়েছেন, রাজনীতি না করলেও তাঁরা কিছু কম সচেতন নন। সিদ্ধান্ত তাঁরা নিজেরাই নিয়েছেন। কোন কিছুর তোয়াক্কা না করে নির্ভয়ে ভোট দিয়েছেন। এ নির্বাচনের শ্রেষ্ঠাংশে কোন ব্যক্তি অথবা দল নয়, সাধারণ মানুষ। জনতা। এখানেই বাংলার বৈশিষ্ট্য।

এ জনতার বাইরেও জনতা আছে। ভেড়ার পালের মত তাঁরা অনুসরণ করতেই জানেন। তাঁরা খুব বেশি হলে নির্বাচন চিত্রের একসট্রা। □

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্র

□ নন্দলাল ভট্টাচার্য

ওঁরা সন্ন্যাসী। সংসার বিবিক্ত জন ওঁরা। পরমের সন্ধানে ঘর ছেড়ে ওঁরা যান পর্বতে কন্দরে, বনে বনান্তরে। সাধনায় বসেন ওঁরা। হন আপ্তকাম। আসে সিদ্ধি, ঋদ্ধি। তারপর একদিন অনেকেই আবার ফিরে আসেন লোকালয়ে। আপন সাধনায় যা করেছেন করায়ত্ত, কঠিন কঠোর পথে এসেছে যা, লোককল্যাণে তাকেই করেন প্রয়োগ। মানুষকে তাঁরা দেখান মুক্তির পথ। অর্থই যে জীবনের চরম লক্ষ্য নয়, এই সত্যটি বুঝিয়ে দেন পরমার্থের সন্ধানে ব্রতী হয়ে। লোকহিতে তাঁরা হন কল্পতরু। সেই কল্পতরুকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে আশ্রম। ক্রমে আধ্যাত্মিক জগতের তাঁরা হয়ে ওঠেন অধীশ্বর। তারপর?

প্রশ্ন ওঠে বারবার—তারপর? বিষয় বিষ। সেই বিষে বিষাক্ত না হবার বাসনায় যাঁরা ছাড়েন ঘর, তাঁরা আবার জড়িয়ে পড়েন বিষম বিষের যন্ত্রণায়। লোকহিতে গড়ে ওঠে যে আশ্রম, অনেক সময়ই তা হয়ে ওঠে আশ্রম-প্রধানের বোঝা। সে বোঝা বইতে গিয়ে কখনও হয় স্খলন, কখনও দেখা দেয় দ্বন্দ্ব, দ্বেষ, আদালতেও সব কিছুর শেষ হয় না। কামিনী কাঞ্চন যাঁদের কাছে বিষ্ঠার মতই পরিত্যাজ্য তাঁদের অঙ্গে কেন জড়িয়ে পড়ে সেই বিষ্ঠার দুর্গন্ধ? কাঞ্চন কি তাহলে শেষ পর্যন্ত গ্রাস করে নির্লোভ চিত্তকে? ক্ষমতার মোহ কি তবে সর্বগ্রাসী? গুরুজীবন কি শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে গুরুভার? প্রশ্ন নানা, উত্তর মেলা ভার।

সন্ন্যাস জীবনে আপন মাধুর্যে যিনি আকর্ষণ করেন সবাইকে, গড়ে তোলেন বিরাট প্রতিষ্ঠান—কর্ম ও ধর্মের যজ্ঞ চলে পাশপাশি, সেই তিনি যখন হন লোকান্তরিত—তখন কেন দেখা দেয় বিরোধ? কেন আশ্রমের অধিকার নিয়ে হয় ঘৃণ্য কাজিয়া? কেনই বা এক ভেঙে দুই হয়, দুই ভেঙে তিন, চার? সবার আদর্শ হয়েও কেনই বা আবার অনেকেই তাঁদের পরিত্যাগ করেন? সে কি তাঁদের সাধনার ত্রুটি, অথবা আমাদেরই? উত্তর, যাই হোক, অর্থই অনর্থ এটাই বড় হয়ে দেখা দেয় এঁদের অনেকেরই জীবনে। আর তখনই মনে হয়, দাও ফিরে সে অরণ্য—কেন সন্ন্যাস? ভাল এই গার্হস্থ্য জীবনই।

হবে নাই বা কেন? আমাদের যেসব শাস্ত্র, তার তো স্পষ্ট নির্দেশ—অতিথি দেব ভাব— অতিথিকে পালন কর তুমি, সন্ন্যাসীকে পরিপালনের ভার তো তোমারই গৃহী। গৃহী তুমি ভোগ কর বিষয়ের যন্ত্রণা, সন্ন্যাসীর জীবনকে কর নিরুদ্বেগ—তাঁদের জীবনকে কর ভাবনাহীন—সাধনার পথে তাঁদের অগ্রগমনে কর সাহায্য। তাই তো স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন আমাদের দেশে গৃহস্থের চেয়ে বড় সাধক আর কেউ নেই। তাঁরা নীলকণ্ঠ হয়ে নিজেরা করেন বিষপান আর সন্ন্যাসীকে যোগান সহজ জীবনের রসদ। সন্ন্যাসীকে সিদ্ধ হতে সাহায্য করেন গৃহী, আবার তাঁকে সংসারের কালিমার মধ্যেও টেনে আনে গৃহী। তাই দেখা গেছে, আমাদের আধ্যাত্মিক জগতে যত কিছু বিরোধ, মতভেদ-হানাহানি তার মূলে রয়েছে গৃহী। কখনও প্রত্যক্ষভাবে সে করে চক্রান্ত অথবা তারই প্ররোচনায় সন্ন্যাসী হন বিষয়ী। গৃহীর সেবা সন্ন্যাসীকে করে তোলে অনেক সময়ই সাধনায় অমনোযোগী, লোভী, অলস। আসলে দৃঢ় ভক্তি, সাধনায় গভীর নিষ্ঠার যে অভাব থাকে অন্তরালে তাই বহুসময় সন্ন্যাসীকে করে অসংযত।

আমাদের দেশে রয়েছেন দুধরনের সন্ন্যাসী—দুধরনের মহাপুরুষ। একদল যাঁরা সম্পূর্ণভাবে বীতমোহ হয়ে আশ্রয় নেন লোকালয়ের বাইরে— কঠোর তপস্যায় করেন সিদ্ধিলাভ এবং সেই লোকবিরল অঞ্চলে থেকেই নীরবে কাজ করে যান লোকহিতে। অন্যদল সাধনার সেই সিদ্ধির সুবাসকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেবার জন্য চলে আসেন লোকালয়ে। বেশির ভাগ সময়ই হয় এঁরা হয়ে পড়েন বিষয়ের বন্দী, অথবা যাঁরা তাঁর ভক্ত, আত্মীয় পরিজন তাঁরাই জোর করে টেনে আনেন তাঁদের বিষয়ের কাদামাটিতে। মজার ব্যাপার, জীবনকালে যাঁর সঙ্গে বিন্দুমাত্র সংযোগ থাকে না আত্মীয়স্বজনের—সেই তিনি আধ্যাত্মিক জগতের অধীশ্বর হবার পর যখন বিপুল ভক্তশিষ্য এবং সম্পদ রেখে হন লোকান্তরিত তখন সেই সম্পদের অধিকার নিয়ে কেন হবে লাঠালাঠি? কেনই বা তা নিয়ে আদালতে যেতেও এতটুকু দ্বিধা দেখা দেবে না? কেনই বা ইস্কন বা আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনা সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা প্রভুপাদ এ. সি. ভক্তিবেদান্তস্বামীর আশ্রম নিয়ে তাঁর সন্তান আদালতের দ্বারস্থ হন? কেনই বা ঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথের তিরোভাবের পর প্রশ্ন ওঠে তিনি সন্ন্যাসী ছিলেন না গৃহী ছিলেন? কেনই বা মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী সম্পর্কে প্রচারিত হয় কুৎসাপূর্ণ পত্র, কেনই বা বালক ব্রহ্মচারী, দাদাজীর নামে আদালতে ওঠে মামলা, রামকৃষ্ণ মিশন থেকে কেনই বা ঘরে আসেন অনেকে, কেনই বা অরোভিলের অধিকার নিতে হয় সরকারকে, কেনই বা কাঞ্চীর শঙ্করাচার্যকে শঙ্করাচার্য হিসেবে মানতে আপত্তি দেখা দেয় অন্যান্য শঙ্করাচার্যদের? আদর্শ, কর্তৃত্ব অথবা সম্পদ— এই তিনই বেশির ভাগের উত্তর।

ধরা যাক শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কথা। ১৮৯৭ সালের পয়লা মে বলরাম বসুর বাড়িতে স্বামী বিবেকানন্দ আহৃত যে বৈঠক থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে জন্ম নেয় রামকৃষ্ণ মিশন অ্যাসোসিয়েশন

১৯০৯ সালে সেটিই বিধিবদ্ধ হয় রামকৃষ্ণ মিশন নামে। বিবেকানন্দ তাঁর সন্ন্যাসী ভ্রাতা এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য ও ভক্তদের নিয়ে শুরু করেন এই মিশন। উদ্দেশ্য ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাদর্শ প্রচার, আধ্যাত্মিক চর্চা এবং জনসেবা। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দর মৃত্যুর পর থেকে মাঝে মাঝেই এ প্রতিষ্ঠানে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। কারণ যাই হোক, বহিষ্কৃত হয়েছেন অনেকে, অনেকে আবার নিজেরাই সরে এসেছেন। বিবেকানন্দর সঙ্গে প্রথম যে ক'জন সন্ন্যাস নেন, স্বামী অভেদানন্দ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। বিবেকানন্দের আহ্বানে তিনি ব্রিটেন, আমেরিকা এবং কানাডায় প্রচার করেন শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবনা এবং রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মধারা। কিন্তু দেশে ফিরে এসে তিনিই ১৯২৩ সালে প্রতিষ্ঠা করলেন বেলুড় মঠ-নিরপেক্ষ ভিন্ন প্রতিষ্ঠান— শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটি।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ঘটল আরেকটি ঘটনা। বেলুড় মঠের কোন এক ব্রহ্মচারীর আচরণ নিয়ে মঠ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে গুরুতর মতপার্থক্য দেখা দিল। পরিণতিতে ওই বছর জন্মাষ্টমীর দিন মঠের ২২ জন সন্ন্যাসী এবং ১০৭ জন গৃহী ভক্ত বেরিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা মঠ। ১৩ ডিসেম্বরে স্থাপিত হল বিবেকানন্দ মিশন। সবার বিশেষ অনুরোধে বাঙ্গালোর রামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী নির্মলানন্দ বিশেষ অনুরোধে বাঙ্গালোর রামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী নির্মলানন্দ বা তুলসী মহারাজ এই নতুন মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ হতে রাজি হন। স্বামী নির্মলানন্দ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য, বিদেশে ধর্মপ্রচারে অভেদানন্দর সঙ্গী এবং বাঙ্গালোর রামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ। বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে আনলেন অভিযোগ, তিনি বাঙ্গালোর আশ্রমকে নিজের মতে চালাচ্ছেন, এ ব্যাপারে বেলুড় মঠের কর্তৃত্ব মানছে না। এই নিয়ে ১৯৩০ সাল থেকে পাঁচ বছর মামলাও চলল। বিচারকের রায় বা শর্তে রাজি হতে না পেরে নির্মলানন্দ বাঙ্গালোর আশ্রম ছেড়ে ত্রিবান্দ্রম ব্রহ্মানন্দ আশ্রমে যোগ দেন, পরে আসেন শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা মঠ ও বিবেকানন্দ মিশনে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের একদা সহসভাপতি স্বামী সর্বানন্দকেও শেষ পর্যন্ত মিশন ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল। ঝাড়গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা পীঠ প্রতিষ্ঠা নিয়ে মঠ ও মিশন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দীর্ঘ মতবিরোধের পরই তিনি মঠ ত্যাগ করেন।

পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন থেকে সরে এসে স্বতন্ত্র আশ্রম এবং কর্মসাধনা যাঁরা শুরু করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য. নিমপীঠ আশ্রমের স্বামী বুধানন্দ, বারাকপুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন ও বিবেকানন্দ মঠের স্বামী নিত্যানন্দ প্রভৃতি। আদর্শের চেয়েও কর্তৃত্বের প্রশ্নটা বড় হয়ে দেখা দেওয়াতেই এঁদের অনেককে মঠ ও মিশন ছেড়ে চলে আসতে

হয়। বিভিন্ন সময়ে এ সম্পর্কে মঠ ও মিশন কর্তৃপক্ষ বলেন, মঠ ও মিশনের কাজে কোনরকম বিশৃঙ্খলা কোন সময়ই বরদাস্ত করা হয় না এবং এ ব্যাপারে কেউ খামখেয়ালিপনা করলে তিনি যত বড় ব্যক্তি বা কর্মীই হোন না কেন, তাঁর বিরুদ্ধে বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়ই। এ কারণেই ৭৫ বছরেরও বেশি পুরনো এই প্রতিষ্ঠানটি এখনও নবীন; সজীব। অন্যদিকে বরাবরই কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, ক্ষমতার শীর্ষে যাঁরা আছেন তাঁরা কোন সময়ই অন্যকে ক্ষমতার কাছাকাছি আসতে দিতে চান না, তাঁদের কর্মোদ্যোগকে কাজে লাগাতে দেন না। শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ ও ভাব প্রচারের চেয়েও নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় তাঁরা বেশি সচেষ্ট। অনেকের আবার অভিযোগ, মঠ ও মিশনের যে বিপুল পরিমাণ সম্পদ রয়েছে মুষ্টিমেয় কয়েকজন তা আগলে রাখতে চান—তাই অন্যদের তাঁরা কর্মতৎপর হতে দেন না।

প্রায় একই ধরনের বিরোধ দেখা দেয় শ্রীঅরবিন্দের পন্ডিচেরি আশ্রমকে কেন্দ্র করেও। ১৯৬৮ সালে শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি বা এস এ এস পন্ডিচেরীর ছ' কিমি দূরে দু' হাজার একর জমিতে অরোভিল নামে এক আন্তর্জাতিক নগর স্থাপনের কাজ শুরু করে। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গঠিত হয় কমিউনিটি অব অরোভিলিয়ানস বা সি ও এ যার সদস্য সংখ্যা এখন ২৩৩। ১৯৭৩ সালে শ্রীমা'র দেহত্যাগের পরই এই দুই সংস্থার মধ্যে বিরোধ তীব্র হয়ে ওঠে। শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটির প্রতি অরোভিলের প্রায় ৭৫ শতাংশ অধিবাসীর সমর্থন থাকলেও সি ও এ বিরোধটা বেশ জিইয়ে রাখে। যার ফলে ১৯৮০ সালের নভেম্বর মাসে সরকার এই নগরের পরিচালনভার গ্রহণ করেন। তার বিরুদ্ধে শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি সুপ্রিম কোর্টে মামলা করে হেরে যায়। সোসাইটি অবশ্য এখানেই থেমে নেই। তবে সোসাইটির এই হারে সবচেয়ে বেশি খুশি হয় সি ও এ। মূলত অরোভিলের কর্তৃত্ব কার হাতে থাকবে তাই নিয়েই ছিল বিরোধ এবং আদর্শ এখানে গৌণ হয়ে যায়। কিন্তু এই বিরোধ সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিয়েছেন তাতে উদ্বিগ্ন দেশের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে নথিভুক্ত প্রতিটি সংস্থা।

কেন্দ্র অরোভিলের কর্তৃত্ব নিয়ে নেবার পর শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি সেই

অধিগ্রহণকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে বলে, প্রতিটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ধর্মীয় এবং দাতব্য কাজ পরিচালনার জন্য সংস্থা স্থাপনের, এবং তা পরিচালনের মৌলিক অধিকার রয়েছে। কিন্তু আদালত বলেন, শ্রীঅরবিন্দ এবং শ্রীমার শিক্ষা কোন ধর্ম নয়, তা তাঁদের দর্শন মাত্র। এ কারণে শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি এই সম্পত্তি পরিচালন সম্পর্কে মৌলিক অধিকারের যে প্রশ্ন তুলেছে তা আইনে টেঁকে না। সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ বলেন, 'সংবিধানে 'ধর্ম' এই শব্দটির সংজ্ঞা দেওয়া নেই এবং এটি এমনই একটি শব্দ যার কোন সংজ্ঞা দেওয়া ঠিক সম্ভব নয়।'

সুপ্রিম কোর্টের এই রায় ভাবিয়ে তুলেছে প্রতিটি ধর্মীয় সংস্থাকে। তাঁরা এখন ঠিক করতে পারছেন না, প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব নিয়ে নিজেদের মধ্যে তাঁরা দলাদলি করে সবকিছুর কর্তৃত্ব সরকারের হাতে তুলে দেবেন, না নিজেরা মিলেমিশে থাকবেন। আসলে ধর্মগুরুদের উপদেশ যা পারেনি, আদালতের রায় প্রায় তাই করতে যাচ্ছে। অন্তত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের কিছুটা সতর্ক পদক্ষেপ ফেলতে বাধ্য করছে।

সতর্ক পদক্ষেপ ফেললেও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা কিন্তু সর্বত্র নিজেদের বিরোধ মেটাতে পারছেন না। সাম্প্রতিক একটি ঘটনা ঘটল শ্রীশ্রীমোহ-নানন্দ ব্রহ্মচারীকে কেন্দ্র করে। ব্রহ্মচারীজির সঙ্গে ট্রাস্টি বোর্ডের মন্দির এবং সেবায়তন পরিচালন নিয়ে বিরোধ এমন একটা পর্যায়ে ওঠে যে মোহনানন্দজী ক্ষোভে দেশত্যাগ করেন। তিনি এমনও বলেছিলেন, অছি পরিষদের সবাই পদত্যাগ না করলে এবং তাঁর পছন্দ মত কমিটি নিয়ে কাজ না করতে দিলে তিনি আর দেশেই ফিরবেন না। অবশেষে অনেক তৎপরতার পর মূলত প্রবীণ সাংবাদিক তুষারকান্তি ঘোষের চেষ্টায় মোহনানন্দজী এ বছরের ২৩শে জুন বিদেশ থেকে দিল্লি হয়ে কলকাতা আসেন।

বিরোধটা বেধেছিল শ্রীশ্রীবালানন্দ ট্রাস্ট ও মোহনানন্দ সমাজ সেবা সমিতি নিয়ে। এই দুই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই মোহনানন্দ বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যান। আসলে মোহনানন্দ সমাজ সেবা সমিতি গঠনের ব্যাপারটা অনেকে ভাল চোখে দেখেন নি। যেমন বহুজনকে ডিঙিয়ে বালানন্দ ব্রহ্মচারীর মোহনানন্দজীকে প্রধান করার ব্যাপারটাও অনেকে মানতে পারছিলেন না। এমনও অভিযোগ উঠেছে যে তাঁদেরই কারো কারো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থনে বর্তমান বিরোধটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এই বিরোধকে কেন্দ্র করে মোহনানন্দজীর বিরুদ্ধে তাঁরই কিছু ভক্ত-শিষ্য যেসব প্রচার পুস্তিকা বিলিয়েছেন তা ধর্মীয় জগতের একটা কলঙ্ক হিসেবে চিহ্নিত থাকবে।

এই বিরোধ সম্পর্কে মোহনানন্দজীর বক্তব্য, তাঁরই ভক্ত-শিষ্যরা তাঁকে অবমাননা করে চিঠি দিয়েছে, আদালতে গেছে, তাঁকে তাঁর মত কাজ করতে দেয় নি। তারই ফলে তিনি বিদেশে যেতে বাধ্য হন। তিনি বলেন, তাঁর অবর্তমানে ট্রাস্টির সেবাইত পদ লাভ করার জন্যই একটি গোষ্ঠী সক্রিয় হয়ে উঠেছে। বালানন্দ ব্রহ্মচারীর মতই তিনিও সেবাইত হিসেবে কল্যানানন্দকে মনোনীত করাতেই অনেক ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি এই ঘোঁট পাকাচ্ছেন বলে তিনি অভিযোগ করেছেন।

মোহনানন্দজীর বিরুদ্ধে এক পক্ষের অভিযোগ তিনি বালানন্দ সেবা প্রতিষ্ঠানের অর্থ তাঁরই নামে প্রতিষ্ঠিত সংস্থার নামে পাচার করছেন। এ সম্পর্কে মোহনানন্দজীর বক্তব্য, গুরু মহারাজ বালানন্দ ব্রহ্মচারীর জীবনের আদর্শ ও আদেশকে ঠিকমত রূপায়িত করার জন্য তাঁর কয়েকজন ভক্ত ও শিষ্য 'সমাজ সেবা সমিতি'টি গঠন করে। গ্রামে গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয় এবং তীর্থে তীর্থে আশ্রম প্রতিষ্ঠাই এর লক্ষ্য। তিনি জানান, বালানন্দজী যে 'ডিড' করে গেছেন তাতে কিন্তু আছে তাঁর অবর্তমানে তাঁর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি শিষ্য-ভক্তদের প্রণামী স্বাধীনভাবে জনকল্যাণমূলক কাজে লাগাতে পারবেন। এমনকি বালানন্দ ট্রাস্টের টাকাও তাঁরা ইচ্ছামত সেবামূলক কাজে

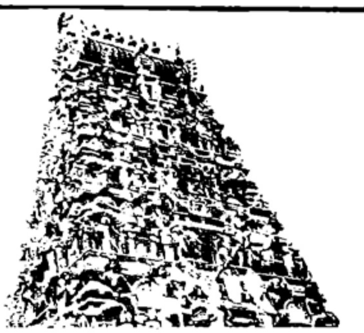

খরচ করতে পারবেন। তাছাড়া এই সমিতি প্রাপ্ত টাকা পয়সার আয়ব্যয়ের হিসাব যেমন ঠিক ঠিক পেশ করে তেমনি সরকারকেও ঠিক ঠিক মত কর দেওয়া হয়। কাজেই টাকা অপব্যবহারের প্রশ্ন উঠতেই পারে না বলে মোহনানন্দজী বললেন।

জীবিতকালেই মোহনানন্দজীর মত সমালোচনার কেন্দ্র হয়েছেন বালক ব্রহ্মচারীও। এছাড়া দাদাজী এবং আরো কারো কারো বিরুদ্ধে আদালতে মামলাও হয়েছে। মামলা হয় বালক ব্রহ্মচারীর বিরুদ্ধেও। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তিনি তার এক শিষ্যার সম্পত্তি বেদখল করেছেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ব্যাপারটির একটা ফয়সালা হয়ে যায়। কিন্তু এখনও বালক ব্রহ্মচারী এবং তাঁর সন্তান দল সম্পর্কে নানা অভিযোগ শোনা যায়। সমাজবিরোধী-দের আশ্রয়দান, মুসলমানদের সঙ্গে বেশি মেলামেশার জন্য '২০ মার্চ কমিটি' নামে এক কমিটি বালক ব্রহ্মচারীর বিরোধিতা করছেন। অনেকে বলছেন, সন্তান দলে নেতৃত্বের প্রশ্ন নিয়ে পারস্পরিক খেয়োখেয়ি রয়েছে, তারই প্রকাশ ঘটেছে এই বিরোধে। তবে সুখচরে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গেও বালক ব্রহ্মচারীর আশ্রমের খুব একটা সুসম্পর্ক নেই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নাম প্রচারের সূত্রে প্রভুপাদ এ. সি. ভক্তিবেদান্তস্বামী যখন সেখানকার বিপুল সংখ্যক মানুষকে কৃষ্ণ প্রেমে মাতোয়ারা করে এদেশে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনা সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করলেন তখনি তাঁর আত্মীয় পরিজনরা তাঁর সম্পর্কে কিছুটা আগ্রহ প্রকাশ করলেন। প্রায় কপর্দকশূন্য অবস্থায় প্রভুপাদ যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান তখন কিন্তু কোন সাহায্যের হাতই তাঁর দিকে প্রসারিত হয়নি। অবস্থাটা দৃষ্টিকটু ভাবে দেখা দিল প্রভুপাদ অপ্রকট হবার পর। ইসকনের সম্পদ, প্রভাব, প্রতিপত্তি দেখে সব কিছু দাবি করে বসলেন প্রভুপাদের ছেলে। শুধু দাবি নয়, তা আদায়ের জন্য দ্বারস্থ হলেন আদালতের। আদালত অবশ্য নাকচ করে দেয় সেই দাবি।

প্রায় একই অবস্থা ঘটে ঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ লোকান্তরিত হবার পর। কিভাবে তাঁর শেষকৃত্য হবে, ক'দিনই বা তাঁর মরদেহ সবার দর্শনের জন্য রাখা হবে তাই নিয়ে বিরোধের শুরু। পরবর্তী পর্যায়ে মহামিলন মঠ এবং জয়গুরু সম্প্রদায়ের প্রধান হবেন কে তা নিয়ে দেখা দিল দ্বন্দ্ব। ঠাকুর সীতারামদাসের ছেলে রঘুনাথ কাব্যতীর্থ বা কিঙ্কর আত্মানন্দ এবং প্রাক্তন পুলিস অফিসার তারক বন্দ্যোপাধ্যায় বা কিঙ্কর মহিমানন্দকে কেন্দ্র করে প্রায় মুখোমুখি হয় দুটি পক্ষ। তৃতীয় পক্ষ হিসেবে ঠাকুরের পৌত্র বিঠ্ঠল রামানুজকে কেন্দ্র করে দাঁড়ায় আরেকটি দল। সব মিলিয়ে অবস্থাটা জটিল এবং ঠাকুরের বহুভক্তই এখন দিশাহারা।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের দেহত্যাগের পরও দেখা দিয়েছে একই ঘটনা। দেওঘর এবং গিধনিতে এখন রয়েছে দুটি গোষ্ঠীর সদর দপ্তর। ঠাকুরকে সামনে রেখে দু জায়গা থেকে চলছে কর্মতৎপরতা।

শঙ্করাচার্য নির্বাচন নিয়েও ঘটে প্রায় এমনি ঘটনা। দ্বারকা এবং জ্যোতির্মঠের শঙ্করাচার্য নির্বাচন নিয়ে কিছুদিন আগে যথেষ্ট জল ঘোলা হয়। এখন একটা বিরোধ দেখা দিয়েছে কাঞ্চীর শঙ্করাচার্যকে নিয়ে। আদি শঙ্করাচার্য বৈদিক সনাতন ধর্ম রক্ষার জন্য ভারতের চারপ্রান্তে স্থাপন করেন চারটি মঠ। দক্ষিণে, শৃঙ্গেরী পশ্চিমে দ্বারকায় সারদা মঠ, উত্তরে জোতির্মঠ এবং পূর্বে পুরীতে গোবর্ধন মঠ। এখন শৃঙ্গেরীর পাশাপাশিই দক্ষিণে কাঞ্চী মঠেরও প্রভাব বাড়তে থাকে বহুদিন থেকেই। আদি শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত মঠের প্রধানদের মত কাঞ্চীর মোহান্তও নিজের নামের আগে 'শঙ্করাচার্য' শব্দটি ব্যবহার করতে থাকেন। এই নিয়ে এতদিন একটা চাপা বিক্ষোভ ছিল। এখন বিষয়টা গেছে আদালতে।

এমনি ভাবে ধর্মগুরুদের কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আশ্রম নিয়ে প্রায়ই নানা বিরোধ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। কেন, তার উত্তর পাওয়া শক্ত। তবে একটা কথা মনে হয়, সমাজবদ্ধ জীব আমরা। মহৎকে আমরা শ্রদ্ধা করি আবার তাঁকে নিজেদের পর্যায়ে টেনে এনে এক ধরনের আনন্দও আমরা পেতে চাই। সম্ভবত এ কারণেই আমাদের আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণ হন কেষ্টা, রামচন্দ্র হন রামা, বুদ্ধদেব হন বুদ্ধু। সাধু সন্ত যাঁরা তাঁদের গায়েও সেইজন্যই আমরা মালিন্য ও কালিমা মাখিয়ে এক ধরনের তৃপ্তি বোধ করি। অর্থকেই পরমার্থ ধরে তপোবনেও তুলি বাজারের হাওয়া। ধর্মের বাগানে ফোটাই অশান্তির ফুল। ধর্মক্ষেত্রকে করি কুরুক্ষেত্র। □

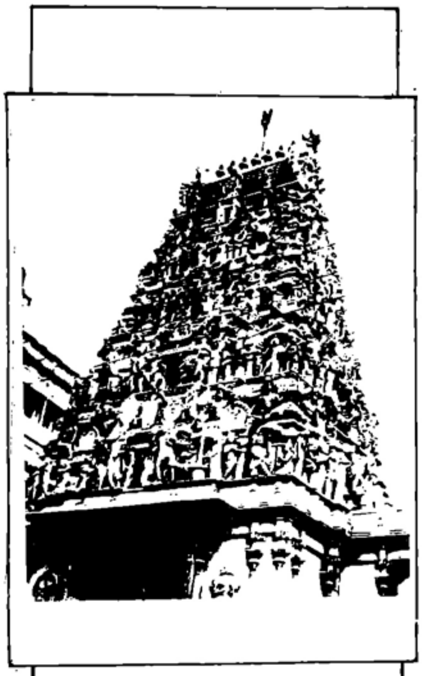

ময়না তদন্তের নামে চলছে প্রহসন

নিজস্ব প্রতিনিধি

সুদীপ্তর মৃতদেহর ময়নাতদন্তকে কেন্দ্র করে পুলিশ ও ডাক্তারদের ঝগড়ার পরিণামে ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে ময়না তদন্তের কাজ হয়ে বন্ধ যায়। প্রথমে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সময় না থাকলেও রাজ্যের সরকারী ডাক্তারদের সংগঠন হেল্‌থ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন (এইচ. এস.এ) সারা রাজ্যে ময়না তদন্ত বন্ধকরার হুমকি দেওয়ায় স্বাস্থ্য সচিব ডাক্তারদের এসংক্রান্ত দাবীদাওয়া নিয়ে আলোচনায় বসেন। তবে শেষপর্যন্ত তিনি যা বলেছেন, তাতে শ্যাম ও কূল আপাততঃ দুটোই রাখা গেলেও রাজ্যে ময়না তদন্তের শোচনীয় অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। স্বাস্থ্য সচিবের কথা থেকে মোদ্দা বা জানা যায় তাহলো ময়না তদন্তের কাজটি স্বাস্থ্যদফতরের নয়, স্বরাষ্ট্র দফতরের এক্তিয়ারে পড়ে এবং ডাক্তাররা তাদের বিধিবদ্ধ ডিউটির বাইরে এ কাজ করে থাকেন দেহ পিছু ২৫ টাকার বিনিময়ে। এবার সেটি ৫০ টাকা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। কিন্তু উপযুক্ত ট্রেনিং ছাড়াই যেকোন ডাক্তার দিয়ে এ কাজ করানোর গুরুতর বিপদটি সম্পর্কে তিনি কোন উচ্চবাচ্য করেননি। শুধু ট্রেনিং সম্পর্কে সরকারী প্রতিশ্রুতির পুনরাবৃত্তি করেই দায় খালাস করেছেন। যদিও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের বিশেষজ্ঞ কমিটির ৮০ সালের রিপোর্ট মোতাবেক শুধু উপযুক্ত ট্রেনিং–ই নয়, মর্গগুলোতে যথাযথ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা রাজ্য সরকার ৮২ সালেই স্বীকার করেছেন।

যাবতীয় চুক্তি ও প্রতিশ্রুতির চেয়েও বড় কথা, ময়না তদন্তের রিপোর্টের উপর বহু মামলা একান্তভাবে নির্ভরশীল। যেকোন অস্বাভাবিক বা সন্দেহজনক মৃত্যুর ক্ষেত্রে হত্যা অথবা দুর্ঘটনার প্রশ্নটি শুধু নয়, এমনকি অভিযুক্তের ভাগ্য নির্দ্ধারিত হয় এরই ভিত্তিতে। বিচারকের নয়, কার্যত ময়না তদন্তের তথা 'মেডিকোলিগ্যাল' রিপোর্ট লেখক ডাক্তারবাবুর কলমের আঁচড়ে দোষী বেকসুর খালাস পেতে পারে। আবার কখনো উল্টোটাও সত্যি হয়। মৃত্যুর নির্দিষ্ট কারণ অনুসন্ধান ছাড়াও মৃতদেহে যেকোন আঘাত কি মৃত্যুর আগে না পরে এইসব খতিয়ে দেখাও ময়নাতদন্তের অন্তর্ভুক্ত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য ফরেনসিক কথাটার মানেই হচ্ছে বিচার সহায়ক। মানুষের জীবন সবচেয়ে মহার্ঘ বিবেচনায় সমস্ত সভ্যদেশের মত এদেশেও শবব্যবচ্ছেদ চালু হয় যাতে কোন ধূর্ততম খুনীও যেন বিজ্ঞানের চোখকে ফাঁকি না দিতে পারে। মৃত্যু যাতে জীবনের সীমানায় স্বেচ্ছাচার চালানোর ছাড়পত্র না পেয়ে যায় তারই জন্যে এত ছুরিকাঁচির আয়োজন। অথচ উপযুক্ত যন্ত্রপাতি সরঞ্জাম এবং বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের অভাবে আজ ময়না তদন্তের নামে লোকচক্ষুর আড়ালে চলছে প্রহসন। এমনকি মৃত মানুষও যে মানুষ, মানবিক মর্যাদা তারও প্রাপ্য, মর্গগুলির নারকীয় দশা দেখলে এই আপ্তবাক্য-গুলোকে উৎকট বিদ্রূপ বলেই মনে হয়। আশ্চর্যের কথা, যারাই একসময় ময়না তদন্তে নানা অব্যবস্থা ও কারচুপির অভিযোগ তুলেছেন, ক্ষমতায় এসে তারাই আজ তাকে সময় নেই বলে এড়িয়ে যাচ্ছেন।

কি ঘটেছিল ?

যে জলপচা দেহটিকে ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে ময়নাতদন্ত করা হল তাঁর প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে ঘরোয়ামহলে ডাক্তাররা সন্দেহ প্রকাশ করলেও সরকারীভাবে তাকে সুদীপ্তর দেহ বলেই স্বীকার করা হয়। এ নিয়ে প্রথমে কোন সমস্যা দেখা দেয়নি। কিন্তু পরে গুঞ্জন শুরু হওয়ায় পুলিশ তার দায় সারতে জানায়, ঐ দেহের আঙুলের নখ ইত্যাদি কেটে নমুনা হিসাবে সংরক্ষণের কাজটি ডাক্তাররা করেনি। ফলে পরিচয় নিয়ে সন্দেহ নিরসনে প্রয়োজনীয় প্রমানটি পুলিশের হাতে রইল না বলে অভিযোগ। এদিকে ডাক্তারদের বক্তব্য, পুলিশ লিখিতভাবে কোনকিছুই সংরক্ষণের জন্য বলেনি। আইনমোতাবেক মৃতদেহের ফটোও তোলেনি। উল্টে এখন তাদের হয়রান করছে। নিয়ম অনুযায়ী যে কোন মৃতদেহের ক্ষেত্রেই রিপোর্টে সমস্তরকমের (আইডেন্টিফিকেশন মার্ক) সনাক্ত চিহ্নই নির্দিষ্টভাবে নোট করার কথা। শরীরের প্রয়োজনীয় অংশ বা ভিসেরা সংরক্ষণের নির্দ্দেশ দেন ডাক্তাররাই।

নিজেদের তদন্তের স্বার্থে, পুলিশও কখনো কখনো বিশেষ অঙ্গ সংরক্ষণের নির্দ্দেশ দেয়। কিন্তু এক্ষেত্রে ডাক্তার এবং দায়সারা পুলিশ কেউই প্রথমে এই প্রয়োজনটা মাথায় রাখেননি। শুধু তাই নয়, এই বিশেষ রিপোর্টটিতেও রয়ে গেছে গুরুতর অসঙ্গতি। এতে লেখা হয়েছে, দেহটিতে চূড়ান্তভাবে পচন ধরে গেছে যদিও ব্রেইন ম্যাটার এখনও প্রায় স্বাভাবিক রয়েছে। অথচ পচনের শেষদশায় ব্রেইন সম্পূর্ণ গলে যাওয়ার কথা। উল্লেখযোগ্য, ডায়মন্ডহারবার সাব ডিভিসন হাসপাতালে বছরে ৬০০ মৃত দেহের ময়না তদন্ত করা হয়। কিন্তু ট্রেনিং প্রাপ্ত দুরে থাক, এ কাজের জন্য ভারপ্রাপ্ত কোন নির্দিষ্ট মেডিক্যাল অফিসারও নেই। কিন্তু ডায়মন্ডহারবারে কেন, গোটা রাজ্যে মাত্র ২৪ জন ট্রেনিংপ্রাপ্ত ডাক্তার আছেন। যদিও রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যসমন্ধীয় উপদেষ্টা কমিটি তার '৭৯সালের রিপোর্টেই জানিয়েছেন 'যেসব মেডিক্যাল অফিসার ময়না তদন্ত করছেন তাঁরা যথেষ্ট অভিজ্ঞ নন এবং এই বিশেষ বিষয়ে তাঁদের জ্ঞানও সীমিত। অন্যদিকে পুলিশ মর্গ থেকে ঠিকমত মৃতদেহ সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না। এছাড়া দেহ সংরক্ষণ ও বহনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা খুবই কম।' এবং ডাক্তারেরও অভাব নিয়মমত শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে রিপোর্ট দিতে হলে দিনে দুটি বা তিনটির বেশি শবব্যবচ্ছেদ একজনের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু করতে হয় কম-করে পাঁচছটা। তদন্তের পর রিপোর্ট পেতে জুতোর শুকতলা ক্ষয়ে যায়। এতে বিচারের কাজ আটকে থাকে।

লোকচক্ষুর আড়ালে

পুলিশ কেসের ক্ষেত্রে, কোন অবস্থায় কিভাবে মৃতদেহটিকে পাওয়া গেছে এবং শরীরের কোথায় কোথায় কি কি আঘাত আছে তার বিবরণ পুলিশ জানিয়ে দেয়। কিন্তু কোন অবস্থায়, কি আঘাতে মৃত্যু হয়েছে, কোনটা মৃত্যুর আগের আঘাত (অ্যান্টে মর্টেম) কোনটা পরের (পোস্ট মর্টেম) এসব নির্ধারণ করার দায়িত্ব তদন্তকারী ডাক্তারের। যে আঘাত শরীরের অভ্যন্তরে (ট্রমা), তা বুঝতে পারে একমাত্র অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ চোখ। সেক্ষেত্রে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ (ক্লট) বা ফুসফুসে রক্তবাহী ধমনী থেকে রক্ত বেরিয়ে এসেছে কিনা (কন্‌জেসন) ইত্যাদি বহু সুক্ষ্ম ব্যাপার দেখতে হয় ডাক্তারকেই। অসুখে বিসুখে ভুগে মারা গেলে ফুসফুস, পাকস্থলী বা যকৃতের ওজন বেড়ে যায়। এছাড়াও সবক্ষেত্রেই রুটিন পদ্ধতি হিসাবেই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলিরই যন্ত্রে ওজন হওয়ার কথা। দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে এমনকি মৃত্যুর সময় আঘাত কোনদিক থেকে এসেছিল সেটাও ফরেনসিক বিজ্ঞানের দৌলতে জানা যায়। কিন্তু অনভিজ্ঞতার ফলে এসবই অর্থহীন হয়ে যায়। কুকুরের লাশের মতই টেনে হিঁচড়ে ডোম একটি মানুষের মৃতদেহকে সশব্দে মেঝেতে ফেলে। হয়ত মাথায় একটা ফ্র্যাকচার হয়ে গেল। অনভিজ্ঞের চোখে এই আঘাত 'অ্যান্টেমর্টেমও' হয়ে যেতে পারে। এতে বেকসুরের ভোগান্তির একশেষ। এমনিতে ডোমরাই কাটেছেঁড়ে এমনকি কোন অঙ্গের কি হাল তাও তারাই ডাক্তারবাবুকে

চিল্লিয়ে জানিয়ে দেয়। দুর থেকে ডাক্তারবাবু দেখেন এবং লেখেন। এই পরিস্হিতিতে কোন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ পরীক্ষা তথা ব্যবচ্ছেদ বাদ পড়ে গেল বা কোন বিশেষ 'কলট বা ট্রমা' তিনি দেখতে পেলেন না, এতে খুনীও খালাস পেয়ে যেতে পারে। আজকাল প্রায়ই বধূহত্যা নিয়ে পুলিশ কেস হচ্ছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অগ্নিদগ্ধ দেহ নিয়ে আইনী মারপ্যাঁচ শুরু হয় এটি হত্যা না আত্মহত্যা। দুটো ক্ষেত্রেই সাক্ষী পাওয়া খুব মুস্কিল। লাঞ্ছনা গঞ্জনার বিবরণ পাওয়া গেলেও নির্দিষ্টভাবে হত্যার দায়ে শ্বশুরকূলের কাউকে অভিযুক্ত করতে চাই উপযুক্ত তথ্য ও প্রমাণ। এক্ষেত্রে কেসটা 'সারকামস্ট্যানসিয়াল এভিডেন্স' আর বেনিফিট অব ডাউটে' মাঝখানে ঝুলতে থাকে। এই অবস্হায় ময়না তদন্তের রিপোর্টই প্রকৃত সত্যকে উদ্‌ঘাটন করতে পারে। কাউকে অন্য উপায়ে মেরে ফেলার পর আত্মহত্যা প্রমাণ করার জন্য গায়ে আগুন লাগিয়ে দিলে জীবিত মানুষের বাঁচবার আকাঙ্খার ফলে যে বিশেষ শরীরী বিভঙ্গ বা রিফ্লেক্স তৈরী হয় তা থাকে না। আর জীবন্ত অবস্হায় পোড়ালে ঐ বিভঙ্গটি স্হায়ী হয়ে যায় প্রায় ভাস্কর্যের মত। একে টেনে হিঁচড়ে অন্যরকম করতে গেলে হাড় ভেঙে যাবে। আর তাতেই ধরা পড়ে জঘন্য অপরাধটি। কিন্তু যে ডাক্তার ফরেনসিক বিজ্ঞানের এই বিশেষ দিকগুলো সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ওয়াকিবহাল নন অথবা অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেন নি। তিনি জীবিত অবস্হায় আগুনে পোড়ার চিকিৎসার অভিজ্ঞতা থেকে এই জটিল পার্থক্যগুলোকে বুঝতে পারবেন না বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। বলাবাহুল্য, এর ফলে কত দেবযানী বা রোশেনারার সম্ভাব্য হত্যাকারীরা বাড়তি উদ্যম পাচ্ছে তার একটা সমীক্ষা হওয়া জরুরী।জলে ডুবিয়ে মারা বা মরার ক্ষেত্রেও এই জটিলতা দেখা যায়। সাধারণতঃ কাউকে মেরে ফেলে জলে ডুবিয়ে দিলে তার শ্বাসনালী এবং ফুসফুসে বালি বা কাদা পাওয়া যাবে না। কিন্তু অনেকসময়েই এমন হয় যে নেহাৎ দুর্ঘটনা হলেও কোনও ভাবে ঐ অঙ্গদুটির দ্বাররুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় বালি ও কাদা ঢুকতে পেল না। এতে মৃত্যুটি হত্যা বলে মনে হতে পারে। এক্ষেত্রে যে অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ থাকলে পার্থক্যগুলোকে বোঝা যায় তা না থাকায় অনেকসময়ই অহেতুক ঝামেলা পাকায়।

ময়না তদন্তের নামে চলছে প্রহসন

সরেজমিন নরকদর্শন

আলিপুরে ২৪ পরগণার অ্যাসি: চীফ মেডিক্যাল অফিসার ও মেডিকোলিগ্যাল সার্জের ডা: এস. কে. মৈত্রের অফিসে গিয়ে যখন পৌঁছোই তখন সেখানে ছোটখাট একটি ভিড়। কেউ এসেছেন ময়না তদন্তের রিপোর্ট নিতে, কেউ করাতে। শোকসন্তপ্ত আত্মীয়স্বজনরা উদ্বিগ্ন মুখে বসে আছেন ময়না তদন্ত শেষে কখন তারা প্রিয়জনের দেহ ফিরে পাবেন, তারই অপেক্ষায়, ডা: মৈত্র আসতেই এগিয়ে এলেন একজন, 'আমি কে পি. ধনরাজ, অলিম্পিক ফুটবলার, আমার বাড়ীর একটি মেয়ে আগুনে পুড়ে মারা গেছে কাল, যদি আপনি তাড়াতাড়ি এর পোস্টমর্টেমটা করে দেন....।' অনুরোধে কাতর ধনরাজের কথা শেষ হবার আগেই হাতজোড় করলেন ডা: মৈত্র। 'দেখুন মড়ার কোন স্টাটাস নেই। মোমিনপুরে আমি একা লোক। কটা বডি একদিনে করব বলুন,' পাশ থেকে হেডডোম রঘু জানাল, 'আজ অভিতক তো আট বডি স্টক হোগিয়া।' 'তাহলে তো আর হবেই না। কাল রোববার ছুটি। সোমবার আসুন দেখি কি করতে পারি।' তিনদিন ধরে এই মেয়েটির লাশ পচবে মোমিনপুর মর্গের বারান্দায়। কারণ সেখানে কোন ডিপফ্রিজ নেই। হাসপাতালের ফ্রিজে যদি স্হান পায় তবে ভাগ্য ভালো। অবশ্য যদি সেখানেও সবকটা ড্রয়ার ভালো থাকে, লোডশেডিং নাহয়, ফ্রিজ বিকল না থাকে।

বস্তুত: পক্ষে পুরান বা কোরাণের অথবা মিলটন, দান্তে, ভার্জিলের নরকও মোমিনপুর মর্গের তুলনায় স্বর্গ। কলকাতার সবচেয়ে ব্যস্ত এই পুলিশ মর্গটিতে বছরে প্রায় আড়াই হাজার শবব্যবচ্ছেদ হয়। দিনে প্রায়ই কুড়ি পঁচিশটি দেহ কাটা ছেড়া চলে। একা ডা: মৈত্র তিনজন ডোমের সাহায্যে এই নরক সামলান। লাশকাটা টেবিল অবশ্য আছে। সবেধন একটা। অথচ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ অনুসারে প্রতি ১০০ টি ব্যবচ্ছেদ একটি করে টেবিল প্রয়োজন। সেই সুপারিশ অনুযায়ী কোন ব্যবস্হা অবশ্য কোলকাতার ৫টি ও সাব ডিভিশনের ৫৯ টি মর্গের কোনটাতেই নেই। কিন্তু মোমিনপুরের অবস্হা সবচেয়ে ভয়াবহ। পনেরো কুড়িটি থানা এর উপর নির্ভরশীল হলেও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ময়না তদন্তের কোন ন্যূনতম ব্যবস্হা এখানে নেই। এই নরকের বারান্দার একদিকে পড়ে থাকে গাদা করা বেওয়ারিশ লাশ। কোনটা পোস্টমর্টেম হয়ে গেছে। কোনটা হবে। ফ্রিজের অভাবে খোলা রোদ্দুরে পড়ে থেকে লাশগুলো পচেগলে যে বীভৎস বিকৃত পরিবেশের সৃষ্টি করেছে, বিশ্বযুদ্ধের সময় কোন গণহত্যার এলাকাও তাতে হার মেনে যাবে। তদন্ত হয়ে যাওয়া লাশ পুলিশের নিয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু তারা জীবিতদের ব্যাপারেই গা লাগায় না তো মৃতদের সদগতি করবে, এমন প্রত্যাশা দুরাশা মাত্র। একটা ছোট্ট করিডর দিয়ে লাশ টেনে হিচড়েঁ নিয়ে যাচ্ছে ডোমেরা পাশের ঘরে লাশকাটা টেবিলে। বারান্দার আরেকদিকে ১০/১২ বছরের পুরোনো সব ভিসেরা সারিসারি কাঁচের জারে সংরক্ষিত। আজও সেগুলোকে উপযুক্ত জায়গায় পাঠানো যায়নি। লাশপচা গন্ধে এলাকা ভরপুর, আশেপাশের মানুষের তা সয়ে এলেও, মাঝে মাঝে তা অসহনীয় হয়ে উঠলে হৈচৈ শুরু হয়। পরিণামে কয়েকদিনের জন্য এয়ারকুলার লাগানো হয়। তারপর যথানিয়মে সেটা যায় চুরি হয়ে। সেটাও হয়ে গেছে অনেকদিন। এলাকার ওয়াগান ব্রেকাররা ডক-স্মাগলার হয়ে যাওয়ার আগে পর্য্যন্ত মর্গই ছিল তাদের সেরা শেল্টার। প্রয়োজনে আজও তারা সেই আশ্রয়ে ফেরে। মর্গের ভেতরে সুস্পষ্টভাবে পরীক্ষা ও নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় আলো নেই। দুর্গন্ধ রোধে একজস্ট ফ্যান নেই। এমনকি ডাক্তারবাবুদের বসার ঘরও কম। ছুরিকাঁচি থাকলেও ভিসেরা বা মৃতদেহ ওজন করার মেশিন নেই। শুধু এখানে নয়, সর্বত্রই ডোমেরা হাতের তোল্লায় লাংস বা হার্টের ওজন ঠিক করে। অথচ সঠিক ওজনের উপর নির্ভর করে মৃত্যুর আগে কোন রোগ ছিল কিনা ইত্যাদি আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এমনকি অনুবীক্ষণ যন্ত্রও নেই। অথচ আঘাত বা মৃত্যুর কারণের নির্ণয়ে এই যন্ত্রের প্রয়োজন প্রতিমুহূর্তে। আর এটাই যেখানে নেই, সেখানে পোর্টেবল এক্স-রে মেশিন বা ফটোগ্রাফী ব্যবস্হা থাকবে না এটা বলাই বাহুল্য, যদিও আধুনিক ময়নাতদন্ত এসব ছাড়া নিধিরাম সর্দার।

নীলরতন সরকার হাসপাতালের মর্গটিতে বছরে তিনহাজারেরও বেশী শবব্যবচ্ছেদ হয়। চারজন মেডিক্যাল অফিসার এখানে আছেন বটে, কিন্তু টেবিল একটিই। অন্যকোন আনুসঙ্গিক মেশিনপত্রও নেই। ফ্রিজের আটটি ড্রয়ারে ৫০ টি দেহও ভরে রাখা হয় জায়গার অভাবে তার উপর প্রায়ই ফ্রিজ খারাপ হয়। ভেতরে ঢুকে দেখি সামনের ঘরটিতে ছাত্রদের জন্যে সিড়িভাঙা বেঞ্চ। পাশের ঘরে মেঝেতে হীরালাল ডোম আর তার ভাইপো সাজন কাঁথায় সুঁচ চালানোর মত ছন্দময় হাতে লাশ সেলাই করছিল। মুন্ডহীন ধড়, রেলেকাটা পচাগলা দেহ, পেটফোলা নাড়িভুঁড়ি বেরোনো মানুষের মাঝখানে বসে সাজন গাইছিল, 'অমর আকবর অ্যান্টনী...' প্রবীন হীরালাল আমায় দেখে বলে, 'ক্যেয়া আপ স্টুডেন হ্যায়, আইয়ে দেখিয়ে, এই বলে সে পরম গাম্ভীর্য্যে বোঝায়, ইয়ে দেখিয়ে কনজেশন, ইয়ে ব্রেন সে ক্লট হ্যায়। উসকা

দেখিয়ে ল্যাকারেটেড ইনজুরি। ওয়ো হ্যায় কাট্‌ ইনজুরি। দো ইঞ্চি মাস উঠা লিয়া ভিসেরাকে লিয়ে। ইস লেড়কীকা। ইউরেটাস প্রেগনেন্ট (গর্ভবতী) হ্যায়। তারপর অবহেলায় সে একটি জারে সংগৃহীত ব্রেইনম্যাটারকে পাউরুটি কাটার মত শ্লাইজ করে যায়। ইয়ে দেখিয়ে কনজেশন হ্যায় কি নেহী।' যতক্ষণ না মাথা ঝিমঝিম করে এতক্ষণ দেখে যাই। বেরোনোর সময় আমার প্রশংসার উত্তরে সে জানায়, আরে বাবু, ডাগদারবাবু কেয়া, হামিলোগই সব কর্‌ লেতে হ্যায়, শ্রিফ উসকো বোল দেতে কেয়া পজিসোন।'

হাওড়ায় পুলিশ মর্গেও লাশকাটা টেবিল নেই। ফ্রিজ আছে কিন্তু কাজ করে না। অন্যান্য যন্ত্রপাতি কিছুই নেই। ইঁদুরে একজন বিশিষ্ট মৃতের চোখ খেয়ে নেওয়ার পর জাল দিয়ে লাশঘর ঘেরার ব্যবস্থা হয়েছে। হাওড়া হাসপাতালে হেড ডোম রমেশের কোয়ার্টারে গিয়ে খোঁজ করতে প্রথমে সে ভাগিয়ে দেয় কোন লাশের আত্মীয় ভেবে পরিচয় দিতে বেরিয়ে আসে। হাতে ফিল্টার উইলসের প্যাকেট। সে জানায়, পুলিশ মর্গের দুর্গন্ধতো তবু আপনি সহ্য করতে পারবেন, কিন্তু হাসপাতালের যে গাদাঘরে বেওয়ারিশ লাশ থাকে তার ধারে কাছে ঘেঁষতে পারবেন না। 'ফিটাস পড়া হ্যায়। কুত্তা খা লেতাহ্যায় কভি কভি।' ফিটাস মানে মৃত প্রাণ বা অপরিণত বাচ্চা। হাসপাতালে অস্থায়ী জেলা চিকিৎসক জানালেন বছরে প্রায় ১২০০ শবব্যবচ্ছেদ হয় হাওড়া পুলিশমর্গে। কিন্তু কোন নির্দিষ্ট মেডিক্যাল অফিসার এর দায়িত্বে নেই। আশেপাশের বস্তির লোকেরা বিকট গন্ধে উত্যক্ত হয়ে প্রতিবাদ জানানোয় জেল পুলিশ কর্তৃপক্ষকে ডি. এম. ও. ডা: চক্রবর্তী ব্যবস্থা নিতে বলেছেন কিন্তু কাজ কিছুই এগোয়নি। চুচুঁড়াতে এরকম হওয়ার পর পাড়ার লোকেরা মৃতদেহ টেনে এনে ডি. এম. ও.-র ঘরের সামনে ফেলে রাখার পর কর্তাদের টনক নড়ে। এই পরিস্থিতিতে কলকাতাইয়া বা তার ঘনিষ্ট মফস্বলী মর্গগুলোর হাল যদি এই হয় তবে দূরতর জেলা বা সাবডিভিসনগুলোর অবস্থা সহজেই অনুমেয়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের রিপোর্ট ১৯৮০ সালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের ফরেনসিক মেডিসিন কমিটি গোটাদেশের ময়নাতদন্ত ব্যবস্থাকে খতিয়ে দেখার জন্যে যে সাবকমিটি গঠন করে, তার রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'যা প্রয়োজন, তার তুলনায় বর্তমান ব্যবস্থার খুব সামান্যই মিল আছে। অধিকাংশ জায়গাতেই মৃতদেহ রাখার এবং পচনরোধ করার ব্যবস্থা প্রায় নেই-ই। যেনতেন প্রকারেন যেখানে সেখানে শবব্যবচ্ছেদ হচ্ছে এমনসব ঘরে বা বাড়িতে, যেটা আর কাজে লাগানো যায় না বলেই মৃতদের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। যন্ত্রপাতির হালও কহতব্য নয়।'

এই বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী প্রতিটি মর্গেই ডিপফ্রিজ ও আলাদা ব্যবচ্ছেদ কক্ষ দরকার। তাছাড়া থাকা উচিত শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের বিশ্রামের স্থান। সদলে তীর্থের কাকের মত নাকে মুখে কাপড় গুজেই বসে থাকতে হয় আমাদের। আস্তাকুঁড় নয়, মর্গকে যতদুর সম্ভব মানবিক পরিবেশের মধ্যে রাখাটাই কমিটির সুপারিশ। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা উল্টোকথাই বলে। মশা মাছি ইঁদুর ইত্যাদির হামলা রোধক ব্যবস্থা, প্রাকৃতিক আলো, যথেষ্ট জল সরবরাহ, একজস্ট ফ্যান ইত্যাদি প্রয়োজন, পূঁতিগন্ধময় পরিবেশকে নির্মল রাখতে। বৈদ্যুতিক করাত ব্যবহারের জন্য লাইন চাই। চাই ছায়াহীন আলো। অন্ততঃ ১৮ টি দেহ রাখবার মত ফ্রিজ ব্যবস্থা। বিশেষ করে কসমোপলিটান শহর গুলোকে যে কোন সময় নানা কারণে গণ মৃত্যুর সম্ভাবনার দিকে তাকিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকা উচিত। বলাবাহুল্য আমাদের তা নেই।

ডাক্তারবাবুদের বসার ঘর, পুলিশ ডিউটি ঘর বা ল্যাবরেটরীও ভিসেরা সংরক্ষণ কক্ষ ইত্যাদি মিলিয়ে কম করেও ৭/৮টি ঘর দরকার। কলকাতার কোনমর্গেই তা নেই। মর্গের বারান্দায় পড়ে আছে ভিসেরা। সেখানে খেলছে ডোমের শিশুরা।

জেলা হাসপাতাল স্তরে, ইলেকট্রিক করাত, দেহ ও ভিসেরা ওজন মেশিন, অনুবীক্ষণ যন্ত্র। মাইক্রোস্কোপও এক্সরে মেশিন থাকার কথা। খোদ কলকাতাতেই এসব নেই।

লাস বহনের জন্য স্ট্রেচার বা ট্রলি প্রায় কোথাও নেই। কুকুর ছাগলের মত ছুঁড়ে ফেলা হয়।

প্রতি একশটি শব ব্যবচ্ছেদ পিছু কমপক্ষে দুটি মেডিক্যাল অফিসার ও অন্যান্য কর্মী দরকার ৮ জন। কোথাও তা নেই। ডোমই পোস্ট মর্টেম টেকনিসিয়ান। সেই আবার সুইপার। অধিকাংশক্ষেত্রেই এরা আবার ক্যাজুয়েল লেবার। যেদিন কাজে নেওয়া হয়, সেদিন ৫/৬ টাকা পায়। □

বিদেশীদের দেখা ভারত সিরিজ
(ইতিহাস)

কৃষ্ণচৈতন্য মুখোপাধ্যায়
ফা-হিয়েনের দেখা ভারত- ৮.০০

প্রেমময় দাশগুপ্ত
মার্কোপোলোর দেখা ভারত ১২.০০
মানুচির দেখা ভারত ১০.০০
ইবন বাতুতার দেখা ভারত-১২.০০
লিনসকোটেনের " ১০.০০
সীদী আলী রঈসের " ১২.০০
তিব্বতী পরিব্রাজকের " ১০.০০
অলবেরুনীর ১০.০০
হিউয়েন সাঙের ২০.০০
ট্যাভারনিয়ারের ৪০.০০
ইৎসিঙের ১০.০০

ডঃ রামরঞ্জন দাস সচিত্র
পশ্চিমবঙ্গের পুরাকীর্তি- ২৫.০০
পশ্চিমবঙ্গের রূপরেখা- ১২.০০

ডঃ এন. কে. সিনহা
বাংলার অর্থনৈতিক জীবন-১৫.০০

গোবিন্দ গোপাল সেনগুপ্ত
তাইমুরের আত্মজীবনী- ১০.০০

ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড
বক্স-৭৮১৮
২৫৭ বি, বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০১২
গ্রামঃ ইন্দোলোজি, কলিকাতা
ফোনঃ ২৭-৪৩৯১
২৭-৪১৬০
৭৭-১০০৯

নো কপিল, নো টেস্ট

কপিল ফিরে এলেন

কি ক্রিকেট, কি ফুটবল—ভারতীয় নির্বাচকেরা যে ভূমিকা নিয়েছেন তা দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধেই যাচ্ছে। ফুটবল টিম থেকে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যকে ওঁরা বাদ দেন; যখন নেন, তখন তাঁর পাশে সুব্রত ভট্টাচার্যের স্থান হয় না। ভারতের ফুটবল টিম শুধু হারেই। গালমন্দ খান খেলোয়াড়রা; নেপথ্যে যাঁরা কলকাঠি নাড়েন, তাঁদের গায়ে কথার আঁচড়টিও লাগে না।

ক্রিকেটেও সেই একই খেলা চলছে। ভারতের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ অলরাউন্ডার কপিলদেব যাঁর প্রুডেনসিয়াল কাপের ১৭৭ নট আউট এখনও সর্বাধিক রান, তাঁকেই ওরা দল থেকে বাদ দিলেন। বিচারকদের হাতে ফাঁসি ছাড়া অন্য শাস্তি আছে, কিন্তু আমাদের নির্বাচকেরা শুধু বহিস্কার করতেই জানেন। ভর্ৎসনা, জরিমানা, সতর্কতা—এসবের তোয়াক্কা ওঁরা করেন না।

শেষপর্যন্ত গাভাসকরপন্থী নির্বাচকদের যে ডিগবাজি খেতে হবে তা জানাই ছিল। গাভাসকার আগে একবার লিখিতভাবে দলে থাকবেন না জানিয়েছিলেন। এন. কে. ভি. সালভে সেবারও দুজনকে ডেকে ব্যাপারটা মিটিয়ে দিয়েছিলেন। এবারও কপিল—সুনীল লড়াই সালভে থামিয়ে দেবেন, কলকাতায় কপিল নতুন উদ্যম নিয়ে খেলবেন—সেটা বোঝাই যাচ্ছে। দুঃখ হচ্ছে অক্ষম নির্বাচকদের জন্য। মিছিমিছি তাঁরা জলঘোলা করলেন। কলকাতার 'নো কপিল, নো টেস্ট' গর্জন আর সালভের হুংকারের কাছে তাঁরা আত্মসমর্পন করলেন।

সুনীল বনাম কপিল

অজয় বসু

ডাকসাইটে ক্রিকেটার সুনীল গাভাসকার ও কপিলদেবের মধ্যে যে খেলাটা জমে উঠেছে তা ভারত—ইংলন্ডের টেস্ট ক্রিকেটের চেয়ে কম সাড়াজাগানো ব্যাপার নয়। তবে দুই কুশীলবের কল্যাণে যে খেলা দেখার দুর্ভাগ্য আমাদের মেনে নিতে হচ্ছে তা কিন্তু ক্রিকেট নয়। খেলা ক্রিকেট সদাচরণের প্রতীক। সেই প্রতীকে যুযুধান দুই মূর্তি বড়ই বেমানান। পরস্পরের দিকে বাঁকা দৃষ্টি হানা, দাঁও কষাকষি করা, অসহযোগিতায় উলটো দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকা, নির্বাচিত দলপতির কর্তৃত্ব অস্বীকার করা এবং পাঁচজনের সামনে প্রকাশ্য বচসায় জড়িয়ে পড়া কাদের সাজে? কারুরই সাজে না। বিশেষত: ক্রিকেটার ও স্পর্টসম্যানদের তো নয়ই।

ভারতীয় ক্রিকেটের দুঃখের ও লজ্জার কথা এই যে জাতীয় দলের দুই জবরদস্ত খুঁটি কুস্তির দঙ্গলে মেতে ওঠার মানসে আখড়ার মাটি মাখতে শুরু করে দিয়েছেন। মাটি মাখা মুখাবয়ব যে কিম্ভূতকিমাকার হয়ে গেল, সে হুঁশ তাঁদের নেই। যতোই তাল ঠুকছেন ততোই তাঁরা নিজেদের হতশ্রী করে তুলছেন। এবং ততো তাড়াতাড়িই তাঁরা জাতীয় ক্রিকেটকে সর্বনাশের পথে ঠেলে দিচ্ছেন। এই চুলোচুলি যদি তাঁদের

ব্যক্তিগত ব্যাপার হোত তাহলে তা নিয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন দেখা দিত না। কিন্তু যেহেতু তাঁরা জাতীয় দলের প্রতিনিধি সেই হেতু বিষয়টি এখন জাতীয় স্তরে প্রসারিত হয়ে গেছে। তাই জাতিগত স্বার্থ চিন্তায় সব সুস্থমনাদেরই দুশ্চিন্তা বেড়েছে।

কপিল আর সুনীল, কেউ যেন কাউকে সহ্য করতে পারছেন না। কপিল, অধিনায়ক হন তো সুনীল দলের ভালমন্দ সম্পর্কে নির্লিপ্ত হয়ে যান, দলপতির প্রতি অসহযোগিতার মনোভাব প্রকাশে বেপরোয়া ব্যাট চালিয়ে নিজের মূল্যবান উইকেট বিলিয়ে দিতে চান। আর সুনীল যদি নেতৃপদ ফিরে পান তাহলে কপিলও বুঝি মন দিয়ে প্রাণ ঢেলে বল করেন না এবং দলপতির পরামর্শও নির্দেশ উপেক্ষা করে যখন তখন অতিষ্ট হয়ে সাজঘরে ফিরে আসতে চান। শোনা গেছে যে অস্বাভাবিক আচরণের জন্যে অধিনায়ক দলপতির কিছু বলতে চাইলে কপিল নাকি তাঁর মুখের ওপর দুচার কথা শুনিয়ে দিতেও কসুর করেন না। শোনা কথা সত্যি হলে বলতে হয় যে নিয়ম শৃঙ্খলা ভাঙগার, দলপতির প্রতি আনুগত্য অস্বীকার করার এর চেয়ে আর উদ্ভট দৃষ্টান্ত আর কী হতে পারে? দুজনেই সিনিয়র খেলোয়াড়। দুজনেই জাতীয় দল পরিচালনার সম্মানজনক অধিকার পেয়েছেন। তা সত্ত্বেও পরস্পরকে শিক্ষা দিতে তাঁরা আজ যে খেলায় মেতেছেন সে খেলা তাঁদের পক্ষে সম্মানজনক ও সম্ভ্রমজাগানো নয়। সিনিয়রদের দেখে জুনিয়াররা অর্থবহ শিক্ষা পেয়ে থাকেন। কিন্তু পরস্পরকে দেখে নেওয়ার লড়াইকে জিইয়ে রেখে কপিল আর সুনীল, দুই সিনিয়ার জুনিয়ারদের উদ্দেশ্যে কোন্ শিক্ষণীয় নজির গড়ে রাখতে পারলেন? যা তাঁরা করে বেড়াচ্ছেন, নেপথ্যে অথবা প্রত্যেকে তার কুপ্রভাব সংক্রমণের মত দলের অন্য খেলোয়াড়দেরও ছুঁয়ে থাকবে। পরিণামে দলগত সংহতি হবে খান্‌খান্। টিম্ স্পিরিট ঢাকনা খোলা কৌটায় রাখা কর্প্পূরের মত উবে যাবে। যাবেই বা বলি কেন, হয়ত এতোদিনে তা খাঁচা ছাড়া পাখির মত শূন্যে ভাসতে ভাসতে মহাশূন্যেই বিলীন হয়ে গেছে। অবস্থাটা দূর থেকে আমরা অনুমান করতে পারি। আর নিশ্চিত জানতে পারেন খেলোয়াড়েরা নিজেরাই। যা সত্য ও নিশ্চিত ঘটনা খেলোয়াড়েরা খোলা গলায় তা না জানালেও দূরের অনুমান যে মিথ্যে তাই বা বলি কেমন করে? দিল্লির ঘটনা, শান্তি বিধানে কপিলদেবকে দলছুট্ করে রাখার পর তো আর ঢাক্ ঢাক্ গুড় গুড় করা চলে না।

শাক্ দিয়ে কী আর মাছ ঢাকা যায়? যায়না। তাই দ্বি-পাক্ষিক মনান্তর ও অসহযোগিতার ভাব ফল্গুধারার গতি প্রকৃতি ভুলে প্লাবিত নদ-নদীর মেজাজে তর্জন গর্জন শুরু করে দিয়েছে। গোপনতার খোলস এখন ঢিলে। জানাজানির আর কিছু বাকিই নেই।

দ্বৈরথের সূচনা কোথায় ও কেন তা ঝালিয়ে নিতে হলে আমাদের একবার পেছন ফিরে তাকাতে হয়। সূচনা ১৯৮৩-তে। পাকিস্তানে একটিতে না জিতে তিন তিনটে টেস্টে হেরে ভারতীয় দল স্বদেশে ফিরে আসার মুখে সুনীলকে নেতৃপদ থেকে সরিয়ে সেই আসনে বসানো হয় কপিলকে। নেতৃপদ থেকে নিজের অপসারণ সুনীলের মনপসন্দ হয় নি। তিনি নির্বাচকদের শিক্ষা দিতে চাইলেন। কিন্তু নির্বাচকেরা তো ধরা ছোঁয়ার বাইরে। তাঁদের শিক্ষা দেন কী করেই বা! নাগালে ছিলেন নবনায়ক। তাঁকে শিক্ষা দিয়েই তিনি নির্বাচকদের ওপর গায়ের ঝাল মেটাতে চেষ্টিত হলেন। এ যেন ঝিকে ঠেঙিয়ে বউকে শিক্ষা দেওয়ার কায়দা আর কী। কপিলের নেতৃত্বাধীন দল সম্পর্কে সুনীল অত:পর নির্লিপ্ত থাকার ভান্ করতে লাগলেন, হয়ে উঠলেন কপিলের প্রতি অসহযোগিও। এই অসহযোগের চূড়ান্ত প্রতিফলন ঘটল গত বছর কলকাতা টেস্টে যখন দ্বিতীয় ইনিংস দলের চূড়ান্ত প্রয়োজনীয় মুহূর্তে চূড়ান্ত দায়িত্বহীনতার পরিচয় রাখতে ব্যাট হাতে বেপেরোয়া যথেচ্ছাচারে লিপ্ত হলেন সুনীল গাভাসকার। অনেক দিনের মেহনতে পরিশ্রান্ত বোধ করায় আর দলের ইনিংসের গোড়াপত্তন করতে চান না, এই কৈফিয়ৎটিও সুনীল আড়কাঠি মারফৎ প্রচার করে দিলেন, যদিও দলপতি কপিল চাইছিলেন যে সুনীল যথারীতি ওপেনই করুন। দলপতির ইচ্ছাপূরণে কোনো তাগিদ সেদিন সুনীল অনুভব করতে চান নি। তাই ইনিংস ওপেনে নিজের অনিচ্ছা প্রকাশ

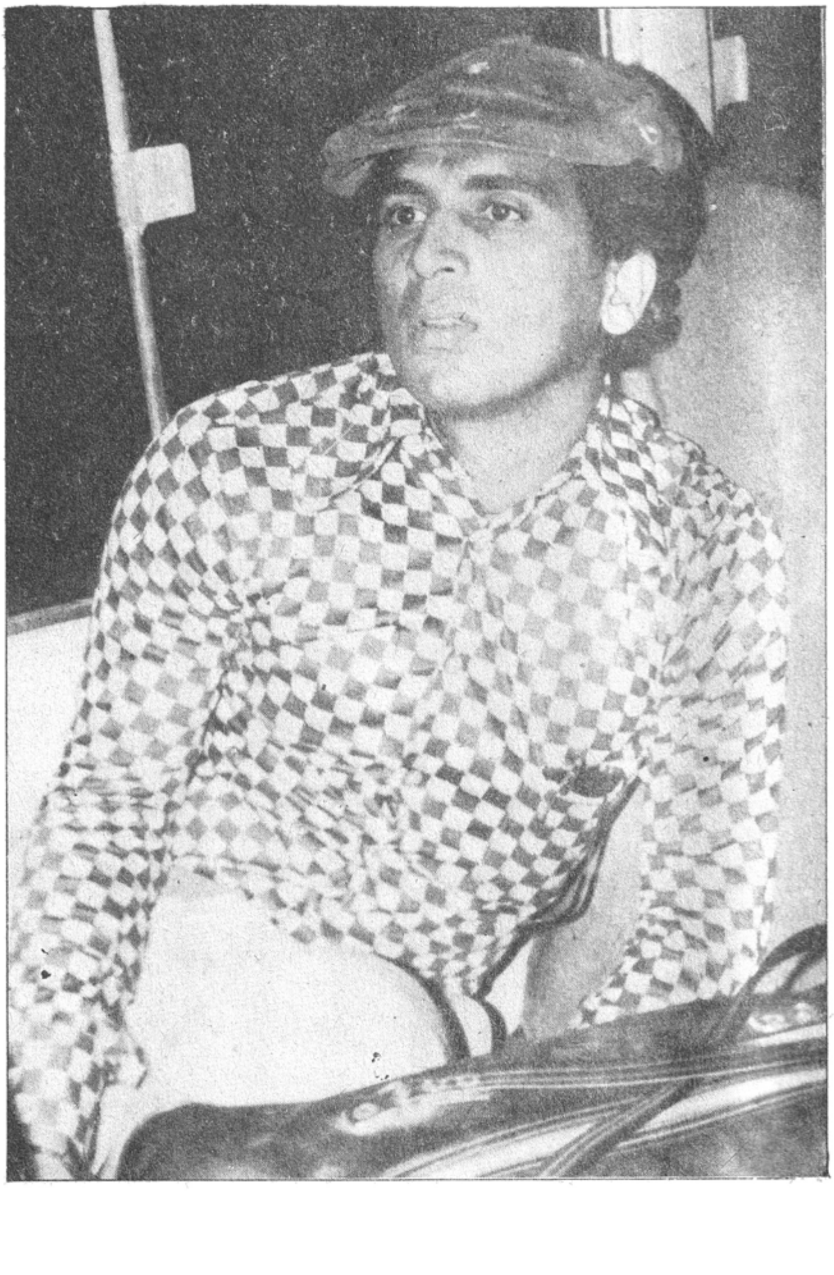

করেছিলেন। আসলে পরিশ্রম ভারে শ্রান্তি, ক্লান্তির অনুযোগ নিছকই যেএক অজুহাত উত্তর অধ্যায়ের ঘটনাবলীতেই তার প্রমাণ মিলেছে। পরবর্তী পর্বে সুনীল যখন অধিনায়কের পদ ফিরে পান তখন কিন্তু সব পরিশ্রমের ভার ভুলে থেকে নিজেই ওপেন করতে স্ততঃস্ফূর্ত ভাবে এগিয়ে গেছেন। কপিল যখন দলধিনায়ক তখন দলের কারুর কারুর কাছ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা যে পাচ্ছিলেন না সেকথা বলার ফাঁকে কপিল নিজেই একবার প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁর দলের কেউ কেউ জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণে যতো নন তার চেয়ে অনেক নিরিষ্টচিত্ত নিজেদের পাওনাগন্ডা আদায়ে। অধিনায়কের এই মন্তব্যে ঘৃতে আহুতি পড়ার উপক্রম ঘটালেও ব্যাপারটা তখনকার মত ধামাচাপা দিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ছাই দিয়ে ঢাকতে চাইলেই কি আর আগুন সর্বক্ষণের জন্যে চাপা থাকে? থাকে না। থাকেও নি।

সর্বশক্তিমান ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে পরপর দুপর্যায়ে ভারত হেরে যাওয়ার পর কপিলকে সরিয়ে সুনীলকে আবার নেতৃপদ ফিরিয়ে দেওয়া হলে ধিকিধিকি আগুন ছাইভস্মের ওড়না সরিয়ে মুক্ত মেজাজে আঁচ ছড়াতে শুরু দেয়, যে আঁচের গণগনে অস্তিত্ব অনুভব করা যায় ফিরোজ শাহ্ কোটলাতেই। অসহযোগিতার কথা মনে রেখে স্বয়ং কপিলই এবার বদলা নিতে চাইলেন নিজে অসহযোগী হয়ে উঠে, দলপতির প্রতি আনুগত্য দেখাতে অস্বীকার করে। ফলে দল থেকে কপিল গেলেন কোতল হয়ে। কপিলের মত সর্বকালের এক সেরা অলরাউন্ডারের দল থেকে ছাঁটাই হয়ে পড়ার এক অপ্রত্যাশিত, অভাবনীয় ব্যাপার বটে। তবে নিয়ম শৃঙ্খলার প্রতি যিনি শ্রদ্ধাশীল নন এবং দলনেতার প্রতি আচরণে যিনি দুর্বিনীত বলে অভিযুক্ত তাঁর অপসারণ বিস্ময়করও নয়। শৃঙ্খলা যদি ভেঙেগ থাকেন তাহলে কপিল তার যোগ্য শাস্তি পেয়েছেন। কিন্তু শৃঙ্খলা ভঙেগর অপরাধ সত্বেও সুনীলের শাস্তি বিধানে নির্বাচকমন্ডলীর কোনো উদ্যোগ দেখান নি। না দেখানোটাই বৈষম্য ও কুবিচারের নামান্তর। একজন নিজের স্বভাবের টানে দোষ করে ফেলেছেন খোলাখুলি। অন্যজন চতুরতার আশ্রয়ে অপরাধ করেছেন চুপিসাড়ে। কেউই ধোয়া তুলসীপাতা নন। তাই প্রশ্ন, একজনের গলায় ঘণ্টা ঝুলিয়ে অন্যজনকে নির্দোষ জ্ঞানে বেকসুর খালাস করে দেওয়াই হবে কেন?

তবে এই প্রশ্নের আলোচনা আপাতত: উহ্য রেখে মূল প্রসঙেগর অবতারণায় বলি যে দুই ব্যক্তিত্বের সংঘাতের এবং ব্যক্তি স্বার্থের সংঘর্ষে জাতীয় ক্রিকেটের স্বার্থই বিপন্ন হয়ে উঠছে। দুজনের কোঁদল গোটা দশকেই প্রভাবিত করছে। ফলে ক্ষতি যা হবার তা হচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেটেরই। এই অভিশপ্ত পরিবেশ থেকে জাতীয় ক্রিকেটকে মুক্ত করার দায়দায়িত্ব আজ প্রশাসনের ওপর বর্তেছে। সুনীল গাভাসকার ও কপিলদেবের মত খেলোয়াড়কে দলছুট্ রাখার বিলাসিতা ভারতীয় ক্রিকেট প্রশ্রয় দিতে পারে না। প্রায়োগিক যর্থার্থ মূল্যায়নে দুজনেই এখনও দলের পক্ষে অপরিহার্য। তাঁদের অথবা দুজনের একজনকে বাদ দিয়ে দল গড়ার অর্থ হল ক্রিকেটে ভারতের সেরা সংগতি সংহত করায় অপারগতা। প্রশাসন যদি সব সামর্থ সংহত না করতে পারে তাহলে টেস্ট ক্রিকেট যোগ দেবার সাধ আহ্লাদ অর্থহীন হয়ে পড়ে না কি?

প্রশাসন জাতীয় স্তরের ক্রিকেটারদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করেছেন, পারিশ্রমিক হিসেবে মোটা টাকাও তুলে দিচ্ছেন খেলোয়াড়দের হাতে। অবসৃত তারকাদের ভবিষ্যত ভাবনায় ত্রাণ তহবিলও খুলেছেন। **খেলোয়াড়েরা ক্রিকেট থেকে পার্থিব সুখ, স্বস্তি, নিরাপত্তার আশ্বাস পাচ্ছেন। নামডাক, আদর, আপ্যায়ন, বীরপুজো, সবই জুটছে কপালে। কিন্তু এসবের প্রতিদানে খেলোয়াড়েরা ক্রিকেটকে এবং দর্শক সাধারণকে কীএবং কতোটা দিতে রাজী থাকছেন তা কী তাঁরা নিজেরা ভেবে দেখছেন।** ক্রিকেট তো শুধু এক খেলাই নয়, ক্রিকেট সৎ আচরণ ও সুস্থ জীবনবোধের নামান্তর, যার ঝলমলে প্রতিভাস অনুরাগীদের মনে দীপ্ত বয়ে আছে। সেই প্রতিচ্ছবির ঐশ্বর্যবজায়, বৈশিষ্ট্য বাড়াতে খেলোয়াড়েরা আজ কী করছেন?

ব্যক্তিস্বার্থের পেছনে ছোটাছুটি করলে ক্রিকেটাররা নিজেদের হাতেই নিজেদের চরিত্র হনন করে বসবেন। নামকরা ও প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর যাঁরা ছেলেমানুষের মত পরস্পরের সঙেগ কাস্তাকুস্তিতে লিপ্ত হতে চান বয়স হলেও চরিত্রে ও আচরণবিধিতে তাঁরা যে বুড়ো খোকাদের পর্যায়ে পড়েন এই অপ্রিয় সত্যটি খেলোয়াড়েরা বুঝবে কবে? আর্থিক স্বচ্ছলতা, নির্বিঘ্ন ভবিষ্যত, খ্যাতি প্রশস্তি এই সব মিলে কোনো কোনো খেলোয়াড়ের অবস্থা আজ বুঝি আঙগুল ফুলে কলাগাছের মত হয়ে গেছে। **ক্রিকেট সোজা ব্যাটের খেলা, যে খেলা সোজা পথ পরিক্রমণেই খেলোয়াড়দের উৎসাহ যোগায়। তবু সোজা পথ ছেড়ে আজ কেউ কেউ বাঁকা পথ ধরতে চাইছে দেখে দু:খ কার না হয়!** ভারতীয় ক্রিকেট কবে যে এই ট্যাড়া–বাঁকা চরিত্রগুলির প্রভাব থেকে মুক্তি পাবে। সেই ভাবনাই আজকের বড় ভাবনা। সেই ভাবনায় ভাবিত হওয়ার তাগিদ কি সুনীল কপিলেরা অনুভব করতে চাইবেন না? বড় হওয়ার দায় যে অনেক। সে দায়ভার তো বড়দেরই বহন করতে হবে। □

ঘাবড়াও মৎ কপিল

বরুণ বর্মন

এক সময় আমার পরিচিতি ছিল সুনীল গাভাসকারের ঘনিষ্ঠ অনুরাগী হিসেবে। আমি আজও ক্রিকেটার 'সানি'র পরমভক্ত। তবু কপিলদেবকে জাতীয় দল থেকে বাদ দেবার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারছি না। শুধু মানতে পারছি না বলাটা ভুল হবে, আমি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। এ ব্যাপারে যে গাভাসকারের অন্তত প্রচ্ছন্ন সমর্থন রয়েছে সে বিষয়েও আমার কোন সন্দেহ নেই।

কপিলের বিরুদ্ধে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙেগর ও দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যাটিংয়ের অভিযোগ আনা হয়েছে। বলা হচ্ছে, ও ইচ্ছে করে বাজে খেলে ইংলন্ডের জয়ের রাস্তা সহজ করে দিয়েছিল। যে কোন শর্তেই দলের শৃঙ্খলা রাখা যে কোনও ক্রিকেটারের কাছেই অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। আমি জানি না, সে কাজে কপিল কতটা গাফিলতি বা আদৌ গাফিলতি দেখিয়েছিল কি না। কিন্তু কপিলকে আমি দীর্ঘদিন ধরে অত্যন্ত কাছ থেকে ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখেছি। আমরা প্রায় একই সময়ে সম্ভাবনা নিয়ে ক্রিকেট জীবন শুরু করেছিলেন। আমি আজও রাজ্যস্তরেই আটকে রয়েছি। আর কপিল চেষ্টা ও আন্তরিকতার জোরে ধাপে ধাপে বিশ্বের প্রথম সারিতে নিজের জায়গা করে নিয়েছে। এ অবস্থায় হীনমন্যতাজনিত কারণে ওর বিরুদ্ধে বিষোদগার করাই ছিল আমার পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক।

ক্রিকেটে ও জীবনে এই অবস্থা সাধারণত হয়ে থাকে। তবু আমি নিরূপায়, 'কপিল ইচ্ছে করে ভারতকে হারিয়েছে'–এই মর্মান্তিক অভিযোগ আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। ও সেই ধরনের ছেলে যারা জান দেবে, তবু দেশের সম্মান হানির কোনরকম চেষ্টায় বিন্দু মাত্র মদত দেবেনা।

দল থেকে অপসারিত হবার পরে ও

সাংবাদিকদের বলেছে 'দেশের স্বার্থই আমার স্বার্থ।' ব্যক্তি কপিলের চেয়ে ভারতের সম্মান অনেক বড়। আর কেউ বিশ্বাস না করলেও আমি জানি কপিল কথায় ও কাজে দু-মুখো নীতিতে বিশ্বাসী নয়।

কপিল সম্বন্ধে পাতার পর পাতা লিখে যাবার পরেও মনে হতে পারে কোন প্রশংসাই ওর জন্যে যথেষ্ট নয়। ভদ্র, বিনয়ী, সরল, মিশুকে ইত্যাদি শব্দগুলো সম্ভবত ওর জন্যেই অভিধানে লেখা হয়েছে। মানুষ না ক্রিকেটার—কোন কপিল বড় তা নিয়ে মাঝে মধ্যেই ধাঁধায় পড়তে হয়। ক্রিকেটার কপিল দেব নিখাঞ্জের নতুন কোন পরিচয় আজ আর দেবার প্রয়োজন নেই। মানুষ কপিলদেবকে নিয়ে একটা ছোট্ট ঘটনা বলার লোভ সামলাতে পারছি না।

একবার উইলস্ ট্রফিতে বাংলা হরিয়ানা ম্যাচে প্রয়োজনে কপিলকে নিজে হাতে বালতি বালতি জল টেনে নিয়ে যেতে দেখে অবাক হয়েছিলাম। ভারতীয় দলে, এমনকি বিভিন্ন রাজ্য দলেও অতি সাধারণ খেলোয়াড়ের পা যেন মাটিতে পড়েনা। বেশিরভাগই দেখি নিজেদের কেউকেটা মনে করেন। কিন্তু যে ছেলেটি বিশ্ব ক্রিকেটের সবচেয়ে উঁচু চুড়োয় পৌঁছেছে তার মেলামেশা আজও সহজ, সরল। ব্যবহার এতই ভদ্র, নম্র যে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না।

কপিলকে আমি প্রথম দেখেছিলাম প্রায় দশ বারো বছর আগে সর্বভারতীয় স্কুল ক্রিকেটের ট্রায়ালে। ইডেনে। সেবার অবশ্য দুজনের কেউই জাতীয় দলে জায়গা পাইনি। ওর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় দূরে থাক, আলাপই হয়নি। ওর সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় হায়দ্রাবাদে। মৈনুদ্দৌল্লা গোল্ড কাপে। সেবার আমি কপিল ও প্রাক্তন টেস্ট ক্রিকেটার ও আমাদের বন্ধু যোগরাজসিং একই টিমের হয়ে খেলেছিলাম। কপিলের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব করে দিয়েছিল আমার আর এক বন্ধু আমেদাবাদের ছেলে জয়প্রকাশ পান্ডিয়ার।

সেই শুরু, তারপরে কপিল কত বড় হয়েছে কিন্তু আমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্বে চিড় ধরেনি। আসলে সেজন্যেই বলছিলাম প্রাণবন্ত ও অনন্য সাধারণ মনের জোরের অধিকারী কপিল দায়িত্ব জ্ঞান হীন ব্যাট করে ম্যাচ হারিয়ে দেবে—একথা আমি ভাবতেও পারছি না।

কপিল ওইরকম মেজাজি ব্যাটিং-এই চিরদিন অভ্যস্ত। সেটা নিশ্চয় সবসময় কাম্য বা শ্রেয় নয়। ওকে বলেছিও সেকথা বহুবার। ও হেসেছে, কিন্তু নিজেকে শোধরায়নি। তারই মাশুল ওকে আজ দিতে হোল। কপিলকে যে কারণে বাদ দেওয়া হয়েছে সেই দায়িত্ব বোধ হীনতার দায় থেকে গাভাসকারও কিন্তু রেহাই পাবেনা। সানি

অনেকবার বিপদের সময়েও এলোপাথাড়ি ব্যাট চালিয়ে দ্রুত প্যাভেলিয়নে ফিরে এসেছেন।

অথচ সেজন্যে সুনীল বিন্দুমাত্র তিরস্কৃত হননি কপিলকে একবারে দল থেকেই বাদ দিয়ে দেওয়া হল। একই অপরাধে দুধরনের শাস্তি বিধান সম্ভবত ভারতীয় ক্রিকেটেই সম্ভব।

আগেই বলেছি দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ কি ভাবে কপিল করেছে আমি জানিনা। কিন্তু সুনীল নিজে কি অন্যায় করে নি? গুরুত্বপূর্ণ টেস্ট সিরিজ শুরুর মুখে 'রানস্ এন রুইনস্' নামে এক বিতর্কিত বই প্রকাশ করে। বইটির পাতার পর পাতায় সহখেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে নানাভাবে সুনীল বিষোদগার করেছে। সুনীল হয়তো বলবে এসব ওর ব্যক্তিগত মত।

যুক্তিটা মানতে পারব না, কারণ ব্যক্তি সুনীলের চেয়ে অধিনায়ক সুনীলের দায়িত্ব অনেক বড় বলে আমি মনে করি।

কপিল অর্থলোলুপ—আমি তা বিশ্বাস করিনা। আমি নিজে পেসার বলে আরও বেশি করে জানি কি কষ্ট করে ওকে বড় হতে হয়েছে। ওর দৌলতে ভারত বহুদিন পরে একজন প্রকৃত ফাস্ট বোলারকে পেয়েছিল। বোলার হিসেবে ওর কোন তুলনা নেই। রিচার্ড হ্যাডলী ছাড়া সারা বিশ্বে ওর মত সুন্দর আউট সুইং করাতে আমি কাউকে দেখিনি।

প্রতিভাধর এই বোলারকে প্রায় বিনাদোষে বাদ দেওয়ায় ভারত কতটা দুর্বল হল জানিনা কিন্তু প্রতিপক্ষ ইংলন্ড যে লাভবান হোল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কপিলের মত সামান্য অপরাধে অস্ট্রেলিয়ায় ক্রিকেটারদের অল্প বিস্তর জরিমানা করা হয়। ভারতেও সেধরনের কোন শাস্তি চালু করা যেতে পারে। কিন্তু এভাবে দল থেকে বহিস্কার কোনক্রমেই সমর্থনযোগ্য নয়। তাই কপিলের অপসারনের পেছনে কোন যুক্তি আছে বলে আমি বিশ্বাস করিনা।

যাক, আমি বিশ্বাস করি যোগ্যতার জোরে আবার কপিল দলে ফিরে আসবে। ও কখনোই ভেঙ্গে পড়ার ছেলে নয়। আমাদের মন খারাপ হলেই ও উৎসাহ দিয়ে বলতো 'ঘাবড়াও মৎ বর্মন, সব ঠিক হো যায়েগা।' এই মুহূর্তে বিষণ্ণ কপিলকে ওর ভাষাতেই সান্ত্বনা দিতে ইচ্ছে করছে 'ঘাবড়াও মৎ কপিল, সব ঠিক হো যায়েগা।' □

নো কপিল, নো টেস্ট

সৌমিত্র ঘোষ দস্তিদার

কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবের চৌহদ্দিতে বসে ঠিক একবছর আগে বাংলার প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক রাজু মুখার্জী কথায় কথায় বলেছিলেন "গাভাসকারের মত বুদ্ধিমান খেলোয়াড় সারা বিশ্বে খুব কম আছে। খেলা ছেড়ে রাজনীতিতে গেলেও সুনীল উন্নতি করবে।" ধূর্ততা, শঠতা, চাতুর্য ও বাক্য বিন্যাস দ্বারা নির্বাচকদের বশীভূত করে ভারতীয় ক্রিকেটের উজ্জ্বলতার নক্ষত্র কপিলদেব নিখাঞ্জকে টিম থেকে বহিষ্কারের গাভাসকারীয় কীর্তি অনেক পেশাদার রাজনীতিকদেরও ঈর্ষার উদ্রেক করবে।

জানি, কোন কোন মহল থেকে গোটা ব্যাপারটা চাপা দেবার চেষ্টা চলবে। কপিল বিতাড়নের পেছনে সানির কোন ভূমিকা নেই–এধরনের একটা প্রচারও কিছু স্তাবক-কলম থেকে বেরিয়ে আসবে। তবু অস্বীকার করা যাবে না দীর্ঘদিন ধরে যাঁরা ক্রীড়াও ইন্দতে রাজনীতির সাযুজ্য দেখতে বড়ই ব্যগ্র ছিলেন তাদের কাছে কপিল এক বড়মাপের উদাহরণ হয়ে থাকবেন। ভারতীয় ক্রীড়ার ইতিহাসে অবশ্য অবিচার বা বঞ্চনা কোন নতুন ঘটনা নয়। এই বাংলা থেকেই একদা ক্রিকেটার নির্মল চ্যাটার্জী, শ্যামসুন্দর মিত্র, প্রকাশ পোদ্দার বা গোপাল বসুকে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও জাতীয় দলে সুযোগ না দিয়ে বঞ্চিত করা হয়েছিল।

মনে আছে আটচল্লিশ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বিরুদ্ধে দুর্ধর্ষ বল করা সত্ত্বেও ছিমছাম চেহারার ফাস্ট বোলার পুঁটু চৌধুরীর টেস্ট দলে জায়গা না পাওয়ার খবর শুনে ক্যারিবিয়ান অধিনায়ক বোর্ডের সেই সহর্ষ মন্তব্য "থ্যাংক গড, পুঁটু ইজ নট ইন দি টিম।" কপিল উপেক্ষায় সম্ভবত সেই ধারাবাহিকতারই আধুনিকতম সংযোজন।

সেই কপিল, যাঁর সম্বন্ধে সাম্প্রতিক বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অলরাউন্ডার ইয়ান বথাম একদিন উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিলেন "কপিল আমার দেখা সেরা ক্রিকেটারদের একজন। ওর পেস্ ইমরান খাঁর চেয়েও বেশি বিপদজনক।"

সেই কপিল, যাঁর নেতৃত্বে মাত্র সতেরো মাস আগে, ঐকান্তিকতা, দক্ষতা ও দলীয় সংহতিকে সম্বলকরে ভারত বিশ্ব ক্রিকেটের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল। কপিলদেব ভারতকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন। বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি–সর্ববিষয়ে ঐতিহ্য হারানো ভারতও বিশ্ব ক্রীড়ার শীর্ষে উন্নীত হতে পারে–এই বোধের উন্মেষ ঘটানোর কৃতিত্বেই শুধু কপিল অভিনন্দিত হবেনা, ওর কাছে আমরা ঋণী আরও অনেক

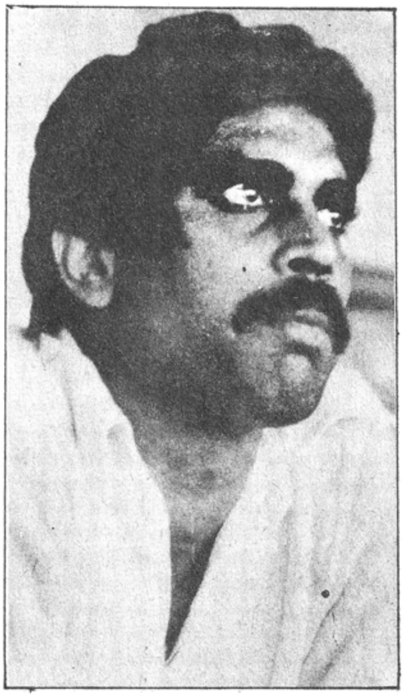

কারণে। দেশীয় ক্রিকেটে হরিয়ানার প্রানবন্ত এই জাঠ তরুণের আবির্ভাব এমন এক সময়ে যখন আমরা প্রায় ধরেই নিয়েছিলাম দ্বিতীয় অমর সিং বা মহম্মদ নিসার আর এদেশে জন্মাবেনা।

কপিল এসে সে ধারণা ভেঙেগ দিয়েই শুধু ক্ষান্ত হয়নি, ওঁর দৌলতেই বেদী, প্রসন্ন চন্দ্রার ভারত অনেক অনেকদিন পরে ফাস্ট বোলিংয়ের ধারে বিপর্যস্ত করেছিল বিশ্বের সামনের সারির, তাবৎ ক্রিকেট দল, স্যার ক্লাইভ লয়েডের দুর্ধর্ষনীয় ওয়েস্ট ইন্ডিজকেও। এ সবইতো ধান ভাঙতে শিবের গীত গাওয়ার মত, কপিলদেব বিতাড়নের কাহিনী শোনাতে গিয়ে ক্রিকেটার কপিলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হওয়া।

মানুষ কপিল কিন্তু আরও বড়। ওঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে বা লিখতে গেলেই ওকে প্রথম দেখার চমকপ্রদ গল্পটা না বলে পারিনা। বেশ কয়েকবছর আগের কথা। উত্তরাঞ্চলের হয়ে সেবার কলকাতায় খেলতে এসেছিলেন। বিরতির দিন হোটেলে গিয়ে দেখি, ওঁর ঘরের দরজা ভেজানো। দুতিনবার নক করার পরেও কেউ খুলছে না দেখে ঠেলে ভেতরে গিয়ে দেখি, ওরই সঙগী, প্রাক্তন এক টেস্ট ক্রিকেটার জনৈক তরুণীর সঙেগ অন্তরঙগ আলাপে ব্যস্ত। পাশের খাটে আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে কপিল চুপচাপ শুয়ে। বন্ধুর উচ্ছ্বাস, আবেগ ওঁকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করেনি।

এই অনন্যসাধারণ চারিত্রিক দৃঢ়তাই সম্ভবত কপিলকে বড় করেছে। দুবছর আগে ওঁর ক্রীড়াকীর্তির সর্বোচ্চ পুরস্কার, শ্রেষ্ঠত্বের রাষ্ট্রীয় শিরোপা 'অর্জুন' পাবার পরে অবশ্য বোম্বের এক সাংবাদিককে নিজের সাফল্যের গোপন রহস্যের সমাধানে স্বয়ং কপিল মন্তব্য করেছিলেন, এর পেছনে কোন দৈব বা যাদুকরী প্রভাব নেই। আমি বড় হয়েছি স্রেফ নিষ্ঠা, আত্মসংযম ও মনের জোরে।

এ হেন খোলামেলা ও সহজ কপিল দেব নিখাঞ্জকে দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যাটিং আর দলীয় শৃঙ্খলাভংগের অপরাধে। বলা হয়েছে দিল্লি টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে কপিল ইচ্ছাকৃতভাবে আউট হয়ে ইংলন্ডের জয়ের রাস্তা সহজ করে দিয়েছিলেন। গাভাসকার নাকি বলেছেন যে, 'দলে প্রধানত কপিলদেবের কাছ থেকে আমি কোন রকম সহযোগিতা পাচ্ছি না। আর এটা শুধু এ সিরিজেই নয়, পাকিস্তান সফরের সময়েও একই ব্যাপার ঘটেছিল।' সন্দেহ হতেই পারে গাভাসকারের এধরনের গুরুতর অভিযোগ কপিলের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিতে নির্বাচকদের উপর চাপ সৃষ্টি করেছে।

কপিল অবশ্য নানা প্ররোচনার মুখে এর পরেও কারু বিরুদ্ধে অভিযোগ না করে শুধু জানিয়েছেন 'ক্রিকেট ছাড়ছি না। আপাতত কয়েকদিন বিশ্রাম নেব। দেশের প্রয়োজনে আবার ঠিক ফিরে আসব। আমরা জানি দেশপ্রাণ আজাদের এই প্রিয় শিষ্য এব্যাপারে মহম্মদ আলির মতই আদম্য অর্থাৎ যা বলেন তাই শেষ অবধি ও কার্যে পরিণত করেন।

সুতরাং কপিলদেব শীঘ্রই ফের টেস্টদলে নিজের জায়গা করে নেবেন, এ আশা করতে দোষ কোথায়!

তবে তার আগে জানা প্রয়োজন কপিলের বিরুদ্ধে গাভাসকারের অভিযোগ কতখানি সত্যি এবং কপিল–সানির দীর্ঘদিনের গোপন যুদ্ধ হঠাৎই বা কেন এভাবে প্রকাশ্যে এল। সন্দেহ নেই, দিল্লি টেস্টে কপিলের আরও বেশি মনোযোগী ব্যাটিং করা উচিত ছিল। যত যুক্তিই দিন না কেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়কের কাছ থেকে হারের মুখে কেউই অসংযমী ভূমিকা আশা করেন না। কপিল বলেছেন, তিনি ওই ধরনের ব্যাট করতেই অভ্যস্ত৷ তাই কি? ধৈর্য ও দক্ষতার মিশ্রণে ওর ষাট রানের প্রথম ইনিংস কিন্তু অন্য কথা বলে।

অবশ্য দায়িত্ববোধহীন ব্যাটিংএর অপবাদ থেকে গাভাসকারও রেহাই পাবে না। বোম্বে টেস্টে ব্যর্থতা বা দিল্লির প্রথম ইনিংসের অক্ষমতা ভারতের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ও বিতর্কিত ক্রিকেট অধিনায়কের

শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় নয়। একবছর আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ইডেনের মাঠে দু ইনিংসেই দেশীয় ব্রাডম্যানের সহজে উইকেট খোয়ানোর স্মৃতিও এত সহজে কলকাতাবাসীর মন থেকে ঝাপসা হয়ে যায়নি। সুনীলের সাফল্যে একসময় আদর করে সবাই নাম দিয়েছিল সুনীল রেকর্ডার গাভাসকার। পেলের ব্রাজিল, ইওসেবিয়র পর্তুগাল বা বিকিলার ইথিওপিয়ার মত সুনীলের ভারত এই পরিচয়ে সমগ্র বিশ্বে ভারতীয়রা গর্ব বোধ করে।

খর্বাকৃতি এই মারাঠীযুবক ভারতকে অনেক দিয়েছে। তাই ওর বিরুদ্ধে কিছু লিখতে খারাপ লাগে। তবু বলি, সুনীলের বোধ হয় মনে নেই ইংলন্ডে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের সময়ে প্রথম দিকের একটি ম্যাচে দীর্ঘক্ষণ উইকেটে থেকে মাত্র তিরিশ রানে আউট হয়ে প্যাভেলিয়ানে ফিরে কিঞ্চিত উদ্বিগ্ন ও বিচলিত সহখেলোয়াড়দের সুনীল বলেছিল এত দুঃখের কি আছে। এই একটু প্র্যাকটিশ করে এলাম। এসব আপাত তুচ্ছ ঘটনায় কিন্তু সানির ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়না।

সুনীল কপিল বিতর্ক নতুন মোড় নেওয়ার জন্যেও কিন্তু সুনীলই অংশত দায়ী। ওঁর সদ্য প্রকাশিত বই 'রানস্ এন রুইনস্'এ কপিলের বিরুদ্ধে একাধিকবার অত্যন্ত অশোভন ভাষায় নানা ধরনের তির্যক মন্তব্য করেছেন। এক জায়গায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে একটা টেস্টের একটি ঘটনার উল্লেখ করে সানি লিখেছেন। "ওই ম্যাচে লয়েডের ক্যাচ নেওয়া আমার জীবনের সেরা ফীল্ডিং। স্বয়ং লয়েড অবধি তাতে মুগ্ধ হয়েছিল। সহখেলোয়াড়রা সবাই উচ্ছ্বসিত হয়ে ছুটে এসেছিল। ব্যতিক্রম শুধু কপিল। ও বলল 'তুমিতো স্রেফ বলটা থামাতে গিয়েছিলে'। 'ওয়েল ট্রায়েড বা ওয়েলকট্ কিছুই নয়।"

কপিলকে যতটুকু জানি তাতে কিন্তু ওকে অতটা অকৃতজ্ঞ ভাবতে পারছি না। মাসকয়েক আগে বারানসীতে এক সিঙগল উইকেট ক্রিকেটে প্রাপ্য অর্থ নিয়েও দেশের দুই সেরা নক্ষত্রের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়েছে। উদ্যোক্তারাই নাকি গাভাসকারকে পঁচাত্তর হাজার টাকা (সানি অবশ্য বলেছে পঞ্চাশ হাজার) সব ক্রিকেটারের মধ্যে ভাগ করে দেবার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কপিলের অভিযোগ, সে নায্য টাকা পায়নি। ওঁর আরও ধারনা, তাদের সবাইকে অনেক কম টাকা দিয়ে সানি বিরাট পরিমান অর্থ পকেটস্থ করেছেন। সানি অবশ্য এসব অভিযোগ সরাসরি অস্বীকার করেছেন।

কপিলকে প্রথম দেখেছিলাম বেশ কয়েকবছর আগে। তখন এত বড় হয়নি। জানিনা মানুষ বড় হবার পর পাল্টে যায় কিনা। তা সত্ত্বেও সপ্রতিও, সরল কপিলের অর্থ গৃধ্নু চেহারা আমি কল্পনাও করতে পারি না। তবু যেকোন কারণেই হোক কপিলের সঙ্গে সুনীলের সম্পর্কের ভিত আলগা হয়ে গেছে। এবং সন্দেহ নেই তারই পরিণতিতে লঘু পাপে গুরুদন্ড কপিলকে পেতে হোল।

ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি এন. কে. পি সালভে অবশ্য পুনরায় দুজনের মধ্যেকার সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছেন। আরও আশার কথা সালভে চেষ্টা করছেন যাবতীয় মনমালিন্য দুর করে সম্মানের সঙ্গে আবার টেস্ট দলে কপিলকে ফিরিয়ে আনার। এলেখা প্রেসে যাওয়ার আগে অবধি কপিলের ভাগ্য নির্ধারিত হয়নি। হয়তো ওঁকে আবার দলে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। তবু ওঁকে অযৌক্তিকভাবে বাদ দেওয়ার ঘটনা ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে কিছু কালির দাগ রেখে যাবেই।

এই মুহূর্তে কপিল বিহীন ভারতীয় দল ভাবা যায় না। ক্রিকেট আর জীবনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। উত্থান পতন আর নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাতে সদাই অনিশ্চিত জীবনই নানাভাবে প্রকাশিত হয় ক্রিকেটে। ফরাসী বুদ্ধিজীবি দামোনিক লাপেয়ারের হৃদয় উদ্বেগকরা জীবন সমৃদ্ধ শহর কলকাতা কপিল অপসারনের যন্ত্রণা সহজে মেনে নেবেনা। মুস্তাক আলীর টেস্ট অন্তর্ভুক্তি না হবার পরে এই শহরই একদা ক্রুদ্ধ স্বরে গর্জে উঠেছিল 'নো মুস্তাক নো টেস্ট।' ঘরের ছেলে সুব্রত গুহকে বাদ দেবার সময়ে একই ভাষায় কলকাতা প্রতিবাদ জানিয়েছিল। চিরকালের বিদ্রোহী কলকাতা আরও একবার ঋজু ভাষায় দাবী জানাক 'নো কপিল নো টেস্ট।।' □

এ রাজ্যে কংগ্রেস ভাঙছে না কেন?

বিশেষ প্রতিনিধি

এ রাজ্যে প্রথম সারির কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে সতী সাধ্বী কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। অমন যে প্রণববাবু তিনিও একবার কংগ্রেস ছেড়ে বাংলা কংগ্রেসে ভিড় করেছিলেন। বরকত সাহেবের রাজনীতিতে প্রথম আবির্ভাব নির্দল বিধায়ক হিসেবে। তখন তিনি কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছেন। ভোটও দিয়েছেন। আনন্দগোপাল মুখার্জি কিছু সময়ের জন্য জনতা ছিলেন। আনন্দগোপাল আর সন্তোষ রায়েরা ছিলেন কংগ্রেস-সতে। যাঁদের ইন্দিরা এবং কংগ্রেস ভক্তি নিয়ে কোন প্রশ্নই তোলা যাবে না। তাঁদের তালিকায় দু চারজন সোমেন মিত্র কিংবা নুরুল ইসলাম থাকতে পারেন। বাকি সকলেই সম্ভবত ক্ষণিকের জন্য হলেও অন্য দল ছুঁয়ে এসেছেন। অবিশ্বাস্য হলেও কথাটা সত্যি। গত নির্বাচনে অশোক সেন কংগ্রেস এবং কংগ্রেস-স থেকে মনোনয়ন পেয়েছিলেন। অন্য কারও এমন সৌভাগ্য হয় নি। শুধু শুধু নয় নিশ্চয়ই। যে প্রতিষ্ঠানের নেতাদের আনুগত্য এমন নড়বড়ে, তার কাছে ভেলকি আশা করা যায় না। অথচ এ রাজ্যের কংগ্রেস তাই দেখিয়েছে।

অসন্তোষ তুঙ্গে, কিন্তু কেউ বিদ্রোহ করেন নি। একজন সদস্যও নয়। কংগ্রেস, যেকোন কংগ্রেসের, ইতিহাসে এমন ঘটনা কখনও কোন রাজ্যে ঘটেনি। মনোনয়ন যাঁরা পাননি তাঁদের মধ্যে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণ কুমার শুক্লা রাজ্য নির্বাচন কমিটির সদস্য। মনোনয়ন পান নি নুরুল ইসলাম, সৌগত রায়, অনুপম সেন প্রমুখ বিশিষ্ট নেতারা। আনতুলে অথবা রামচন্দ্র রথদের মত এঁরা কেউ দলত্যাগ করেন নি। সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে সামান্য ক্ষোভ টুকুও প্রকাশ করেন নি।

এই অসম্ভব কান্ডটি কি করে ঘটল? হেতুইবা কি?

সি পি এম-এর অত্যাচারের ভয়? তাহলে তো সিদ্ধার্থশঙ্করকে দলে টেনে সংগঠনকে আরও জোরদার করা হত। তাহলে? দল থেকে বহিস্কারের ভয়? সে তো আগেও ছিল। এবারও সিদ্ধার্থবাবুতো সে ভয় করেন নি। তবে? ভোটটা পোলারাইজও হয়ে গেছে। সহযাত্রী দল সহ কংগ্রেস এবং সি পি এম ছাড়া অন্য কোন দলকে ভোটাররা ভোট দেবেনই না। হতে পারে না সাধারণ মানুষ সজ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে এই সিদ্ধান্ত করেছেন।

কারণ যাই হোক, এ রাজ্যে কংগ্রেসে এবার অবিশ্বাস্য ব্যাপার ঘটেছে। মনোনয়ন নিয়ে মনোমালিন্য বামফ্রন্টের একটি শরিকে অন্তত ভাঙ্গন দেখা গেছে। কিন্তু কংগ্রেস থেকে কেউ চলে যান নি। অথবা এ রাজ্যের মানুষের মনোভাব কংগ্রেসে ফাটল ধরতে দেয় নি। হেতু যাই হোক, লাভবান কংগ্রেসই। □

রোমান্টিক রাজীব

অজিত চক্রবর্তী

সোমবার সন্ধ্যায় রাজভবনে রাজীব গান্ধীর সাংবাদিক সম্মেলনে যাঁরা ছিলেন, নতুন প্রধানমন্ত্রীকে খুব কাছে থেকে দেখার, তার কথা শোনার দুর্লভ সুযোগ তাঁদের জুটেছে। এর মধ্যে যাঁরা প্রবীন, অতীতের সকল প্রধানমন্ত্রীদের দেখার সুযোগ জুটেছে, তাঁরা নিশ্চয়ই তুলনা করেও ফেলেছেন।

নেহরু, গুলজারিলাল নন্দ (অস্থায়ী হলেও দু দুবার প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন), লালবাহাদুর শাস্ত্রী, মোররাজি দেশাই, ইন্দিরা গান্ধী এবং রাজীব গান্ধী—প্রধানমন্ত্রীদের এই মিছিলে রাজীব একেবারেই আলাদা। কারও সঙ্গে তার তুলনা চলতে পারে না।

এত কম বয়েসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী আগে কেউ হননি। প্রধানমন্ত্রীর তালিকায় রাজীবই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ইংরেজ আমলে জন্ম নিলেও জেল খাটেন নি। রাজীবই একমাত্র প্রধানমন্ত্রী যাঁর মুখে সবসময় হাসি লেগেই থাকে। নেহরুর হাসি দেখা ছিল ভাগ্যের ব্যাপার। তবে যখন হাসতেন, প্রাণখুলে হাসতেন। তেমন হাসি কিন্তু রাজীবের মুখে দেখা যায় নি। এযাত্রায় নয়, আগেও কখনও দেখিনি। যাঁর মুখে সব সময়ে হাসি লেগে থাকে, তার কাছে গালভরা হো হো হাসি আশা করা হয়তো উচিত হবে না। একমাত্র লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মধ্যেই ছোট এবং বড় দুরকমের হাসিই দেখা গেছে।

প্রশ্নের জবাব: রাজীবের জবাবই সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত। অনেক সময়, হয়তো বেশি ক্ষেত্রেই, প্রশ্নের তুলনায় জবাব সংক্ষিপ্ত। তুষার কান্তি ঘোষ একবার দূরদর্শণ সাক্ষাৎকারের পর তাঁর আপন জনদের রহস্যচ্ছলে বলেছিলেন, কি বললাম? বললাম, ইয়েস, নো, ভেরিগুড। প্রশ্ন কর্তা দীর্ঘ প্রশ্ন করলে, ইংরেজিতে যাকে লিডিং কোয়েশ্চেন বলে তাই ছুড়তে থাকেন, উত্তরদাতার ঐ 'ইয়েস, নো, ভেরিগুড' ছাড়া বলবার কিছু থাকে না তুষারবাবু হয়তো এ কথাই বলতে চেয়েছিলেন। রাজীব 'ইয়েস, নো, ভেরিগুডের' দলে নন, তবে বাড়তি কথা বলেন না। এই ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে তুলনা চলতে পারে শুধু শাস্ত্রীরই। অপর সকল প্রধানমন্ত্রীরই সুযোগ পেলে ছোটখাট ভাষণ দেবার প্রবণতা ছিল। শাস্ত্রী এবং নন্দ ছাড়া সকলেই মাঝে মাঝে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন। মাঝে মাঝে ধমকাতেনও। রাজীব এই ব্যাপারেও শাস্ত্রীর দলে। তিনি ক্ষিপ্ত নন, অধিকন্তু সংক্ষিপ্ত।

প্রশ্নের জবাবে এইভাবে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিতে আর কাউকে দেখিনি। সেদিন একজন প্রশ্ন করলেন: এবার নির্বাচনের পর কোআলিশন সরকার হবে কি? জবাব: কেন? (সকলে হেসে উঠলে) আমরা তো মেজরিটি পাচ্ছি।

আর একটি প্রশ্ন : ইন্দিরা হত্যার মুখ্য ষড়যন্ত্রী কলকাতায় ছিলেন। রাইটার্সে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। পরে এ খবর অস্বীকার করা হয়েছে। এসম্পর্কে কিছু বলবেন?

জবাব: রাইটার্সে সাক্ষাৎকারের কথা অস্বীকৃত হয়েছে। অন্য কোথায়ও দুজনে দেখা হবার কথা ওঁরা অস্বীকার করেছেন কি?

এরকম দু একটা জবাব থেকে সন্দেহ হতে পারে চল্লিশ বছরের যুবক প্রধান মন্ত্রীর মাথার বয়েসটা হয়তো কিছু বেশিই হবে। সারা দিন শুধু কথা আর কথা। এত কথার মধ্যে বেফাঁস কথা বেরিয়ে না যাওয়াটাই বিস্ময়কর ব্যাপার। কিন্তু রাজীব এখনও ব্যক্তিগত আক্রমণে যাননি। কোন দলও নয়, আক্রমণ করেছেন গোটা বিরোধী পক্ষকে। যেভাবে আক্রমণ করেছেন, তাতে চটে গেলেও এখনও 'ইন্দিরা হঠাও-' এর মতো "রাজীব হঠাও" ধ্বনি তোলেন নি। ওঁর বিরুদ্ধে তেমন আঘাত এখনও কেউ হানেন নি। একমাত্র ফারুকই বলেছিলেন, রাজীব প্রধানমন্ত্রী হলে দেশ রসাতলে যাবে। এই ব্যাপারটা সাংবাদিক সম্মেলনে উঠেছিল। রাজীবের জবাব ছিল: ওঁকে তো আমি বলিনি কংগ্রেসকে ভোট দিতে। সংক্ষিপ্ত জবাবটিতে যে শ্লেষ আছে তা লক্ষ্য করবার মত।

প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসলেও রাজীবের ভিতরটা এখনও তারুণ্যে ভরপুর। দেখে ঠিক ঠাহর করা যায় না। কেউ ভাবতে পারেন কি যে, সিকিউরিটিরসিক এই মা-মরা ছেলেটি কলকাতায় বুলেট-প্রুফ গাড়িতে চাপবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবেন? চলন্ত গাড়ি থেকে হাত নেড়ে প্রতি অভিনন্দন জানাতে দেখা গেছে তাঁকে।

কলকাতায় গভীর রাত্রে একাকী গাড়ি চালিয়ে শহরটাকে দেখবার ইচ্ছে ছিল তাঁর। এ প্রস্তাব তাঁকে তুলে নিতে হয় রাজ্যপাল দীক্ষিতের চাপে। কিন্তু হাওড়ার এস-পি সুলতান সিংকে রাজীব বেকুব সাজিয়ে ছেড়েছেন সকাল সাড়ে ছটায় হাওড়া ময়দানে নিরুপদ্রব বিরাট জনসভায় ভাষণ দিয়ে। অত সকালে, তাও শীতকালে, অতবড় জনসভা এই প্রথম। সুলতান সিং হাওড়া ময়দানে জনসভা বাতিল করে দিয়েছিলেন নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে। শেষপর্যন্ত রাজীবের কথা তাঁকে গিলতে হয়।

নিশিথে কলকাতার রাজপথে একাকী মোটর বিহারী না হতে পারলেও দিল্লিতে রাজীব সিকিউরিটির সব-কিছু অস্বীকার করে একাকী গাড়ি চালিয়ে তাঁর এক বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিলেন নেমতন্ন রক্ষা করতে। এসেছিলেনও একাকী। একই ব্যাপার করেছিলেন আমেথিতো তখনও একাকী।

নেহরুর মতই রাজীব রোমান্টিক হতে পারেন। তবে রাজীবের রোমান্টিসিজম-এর চরিত্র একেবারেই ভিন্ন স্বাদের। □

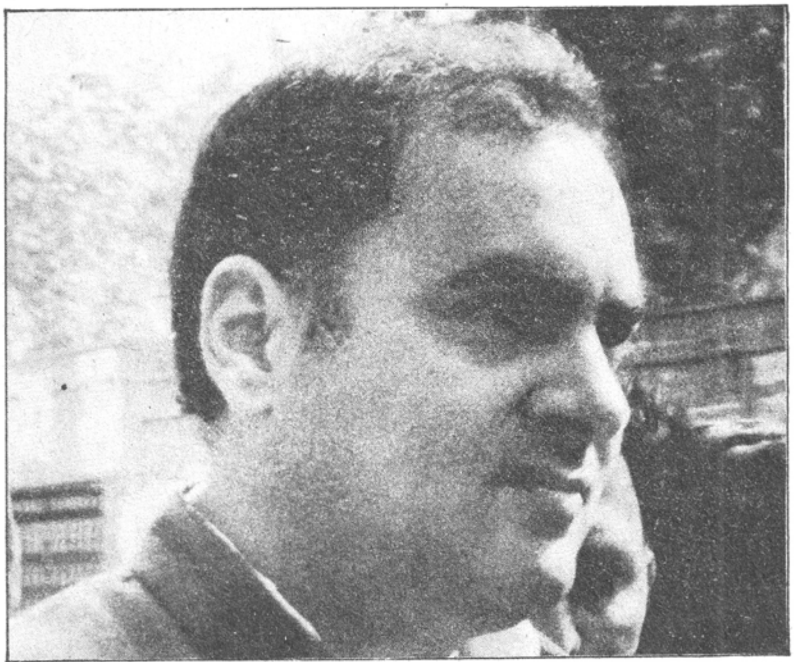

বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভা থাকছে কি ?

বিশেষ প্রতিনিধি

বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভা এত বিপদে কখনও পড়েন নি। প্রতি মুহূর্তের ভয়, কেন্দ্র যে কোন সময়ে এই মন্ত্রিসভা ভেঙে দিতে পারেন। ইন্দিরা যত দিন বেঁচে ছিলেন, এই ভয় কখনই বড় হয়ে দেখা দেয়নি। '৮০তে প্রধানমন্ত্রী হয়ে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা তিনি বেঁচে থাকা অবধি রক্ষিত হয়েছে। অনেকে অনেক সন্দেহ করেছিলেন। ইন্দিরা ক্ষমতায় ফিরে আসতেই সর্বত্র 'গেল, গেল' রব উঠেছিল। কিন্তু ইন্দিরা তাঁর কথা রেখেছিলেন। রেখেছিলেন বলেই একজন বঙ্গ বিখ্যাত সাংবাদিকের ভবিষ্যদ্বাণীও ব্যর্থ হয়, এরাজ্যে যথাসময়ে বিধানসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

ইন্দিরার মৃত্যুর পর পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। বিশেষ করে সাধারণ নির্বাচন ঘোষিত হবার পর। আপাতত বসু মন্ত্রিসভার ভাগ্য নির্ভর করছে এই নির্বাচনের ফলাফলের উপর। ১৯৭৭-এর নির্বাচনে কংগ্রেস কুপোকাত হবার পর জনতা সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী চৌধুরী চরণ সিং এগারটি রাজ্যের কংগ্রেস মন্ত্রিসভার এক কলমের খোচায় খতম করে দেন। রাজ্যপালদের মতামত নেবার ধৈর্যটুকুও তাঁর হয়নি। যুক্তি ছিল অকাট্যঃ যে রাজ্যে জনমতের রায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গেছে, সেখানে কংগ্রেসের রাজ্য শাসনের কোন অধিকার থাকতে পারে না। এই যুক্তি কংগ্রেস-বিরোধী সকল দল সোল্লাসে সমর্থন করেছিলেন। এরাজ্যের বামফ্রন্টতো সর্বাধিক সংখ্যা গরিষ্ঠ সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের মন্ত্রিসভা ফেলে দেওয়া হলে বিজয়োৎসব পালন করেছিলেন। কংগ্রেসের পক্ষে তখন বলবার কেউ ছিলেন না। কট্টর কংগ্রেস-বিরোধী হিসেবে পরিচিত একজন সাংবাদিক অন্ততপক্ষে বেসুরো কথা বলেছিলেন। আনন্দবাজারে রণজিৎ রায় লিখেছিলেন, বামপন্থীরা যে অস্ত্রে সান দিলেন, সেই অস্ত্র একদিন তাঁদের ঘাড়ে কোপ দিতে পারে। তখন তাঁকে অনেকে উপহাস করেছিলেন।

চরণ দাওয়াই-এর বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে মামলা হয়েছিল। রায় কেন্দ্রে পক্ষে যায়।

অতএব এবারের ভোটাভুটিতে বামফ্রন্টের ভরাডুবি ঘটলে বসু মন্ত্রিসভাকে ভগবানও রক্ষা করতে পারবেন না। রক্ষকের ভূমিকা নিতে পারেন শুধু রাজীব। কিন্তু রাজীব কি বামফ্রন্টের প্রতি অহেতুক অতটা সদয় হবেন? যদি হন, কংগ্রেসের মুখ বন্ধ করা সম্ভব হলেও ফ্রন্ট বিরোধী অন্য দলগুলোকে সামলানো কঠিন হবে না কি?

রাজীবকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকবার এই প্রশ্ন করা হয়েছিল। বারবার তিনি একই জবাব দিয়েছেন। বলেছেন, ওয়েট অ্যান্ড সি। কথাগুলো ফ্রন্টের এক সহানুভূতিসূচক বলে মনে হবার হেতু নেই। একজন সাংবাদিক পার্লামেন্টারি নির্বাচনের সঙ্গে বিধানসভার কোন সম্পর্ক নেই এমন কথা তুলেছিলেন। রাজীব তা মেনে নেন নি।

জ্যোতি বাবু নিশ্চয়ই বিপদের গন্ধ পেয়েছেন, নইলে এই বয়েসে অমনভাবে কোমর বেঁধে ঝটিকা সফরে ঝাঁপ দেবেন কেন? রাস্তা খারাপ, তাই কথা ছিল তিনি হেলিকপ্টারে নির্বাচন-বিহার শেষ করবেন। শেষ পর্যন্ত মোটরে করেই তাঁকে সারা রাজ্যে ঘুরতে হচ্ছে। প্রণব-বরকতের উপর রাজীব, নিচে সুব্রত-সোমেন: ওঁদের সঙ্গে একাকী জ্যোতিবাবুকেই পাল্লা দিতে হচ্ছে। অন্য কোন মার্কসবাদী নেতার নাকি জনতার নজর কাড়ার শক্তি নেই।

বামফ্রন্টের যদি ভরাডুবি না ঘটে (যখন লিখছি তখনও নির্বাচনী ফলাফল জানা যায় নি) তাহলে কংগ্রেসের নেতাদের আঙুল কামড়াতে হবে। বামফ্রন্টের হাতে তৈরি অস্ত্রে বামফ্রন্টকে ঘায়েল করার দুর্লভ সুযোগ তাঁদের হাতছাড়া হয়ে যাবে। এর জন্য কে বা কারা দায়ী তা নিয়ে নিশ্চয়ই অনেক জল ঘোলা হবে।

ভরাডুবি না হলেও কিন্তু বিপদ কাটবে না। কংগ্রেস কতটা সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে তার উপর অনেকটাই নির্ভর করছে। কেন্দ্র-বিরোধী ধ্বনি তুলে ইন্দিরাকে যতটা কাবু করা যাবে মনে হয়েছিল, রাজীবের ক্ষেত্রে ততটা মনে করা উচিত হবে কি? নির্বাচনী প্রচারে স্বয়ং জ্যোতিবাবুও প্রণব-বরকত রাজীব সম্পর্কে অনেক তেতো মন্তব্য ছুড়েছেন দুপক্ষই একপক্ষের নেতাদের পরাস্ত করতে আদাজল খেয়ে মাঠে নেমেছিলেন। বরকত সাহেব এবং সমর মুখার্জিও সোমনাথ চ্যাটার্জির রাতের ঘুম চলে যেতে বসেছিল।

উভয় পক্ষে তিক্ততা বেড়েই চলেছে। রাজীব যতই ঠান্ডা মেজাজের হোন না কেন, বয়েস অনেক কম। রক্ত এখনও ঠান্ডা হয়নি, প্রধানমন্ত্রী হবার পরই তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, রাজনৈতিক কৌশল তিনিও জানেন। ইন্দিরার মত তিনিও মুখবুজে মার খাবার পাত্র, এমন ভাববার হেতু নেই। বরং মনে হয় রাজীবের হাত যত শক্ত হবে, বামফ্রন্টের তত বিপদ ঘনিয়ে আসবে। □

অর্থ–নীতি ও সাহিত্য

শ্রীদরিদ্রনারায়ণ দেবশর্ম্মা (অশোক)

এনার্জেটিক্স্

পন্ডিতপ্রবর রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইকনমিক্স্–ক্ষেত্রে আমাদের কস্‌রৎ দেখাইয়াছেন নানা প্রকার। তাঁহার আবিস্কৃত থিওরী অফ ভ্যালু ও এনারজেটিক্স্ সংক্রান্ত তথ্যগুলি আমাদের মনে শীতের আকাশে ধোঁয়ার ন্যায় এখনও সুস্পষ্ট অঙ্কিত রহিয়াছে। এই সূত্রে মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের দেখাইয়াছেন যে জগতে এমন সুদিন আসিবে যখন দ্রব্য–বিশেষের ন্যায্য মূল্য নির্ণয় করা এনার্জেটিক্স্ শাস্ত্র–অনুসারে জলের মতই সহজ হইয়া যাইবে। অর্থাৎ কোন দ্রব্য (দ্রব্য বলিতে মানব উপভোগ্য জিনিস্ মাত্রই বুঝায় তাহা বাস্তব হইতে পারে লাঠির মত, অথবা অবাস্তবও হইতে পারে গান অথবা সেবার মত) উৎপাদনে প্রকৃতি ও ব্যক্তির যতটা এনার্জি খরচ হয় তাহা দিয়াই তাহার মূল্য অবাধে নির্ণীত হইতে পারে। ধরা যাউক রাধাকমল বাবুও কাগজওয়ালা, ছাপাখানা–ওয়ালা, দপ্তরী প্রভৃতি মিলিয়া ক পরিমাণ এনার্জি খর্চা করিয়া একখানা কেতাব উৎপাদন করিলেন, শ্যামু চাষাও সারে গোবরে বুধী–গাই ও বৃন্ধা পিসীমার শ্রমে (ক) পরিমাণ এনার্জি ব্যয় করিয়া এক ধামা ঘুঁটে আনিয়া বাজারে উপস্থিত করিল। ফলে ভবিষ্যতের সেই হাটে রাধাকমল বাবুর এনার্জেটিক্স্–দক্ষ ব্যাপারীরা পুস্তকখানা ও ঘুঁটে উভয়েরই মূল্য নির্ধারণ করিল 'খ' টাকা। ক্রেতা কেহ মিলিবে কি না সে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এখন অর্থনীতির বাজারে রাধাকমল বাবুর এই অভূতপূর্ব থিওরীর মূল্য যাহাই হউক না কেন (তিনি বেশী ঘামিয়া এ তথ্য আবিষ্কার করিয়া থাকিলে এনার্জেটিক্সের নিয়মানুসারে মূল্য অধিকই হইবে) সাহিত্যে সম্প্রতি তাঁহার এ থিওরীর যে প্রয়োগ দেখিতেছি তাহা বিশেষ উপভোগ্য। ধরা যাক কোন বিরহীর বক্ষের বেদনার বেগ হইতেছে 'ক'। আর এক ব্যক্তির পৃষ্ঠে ফোঁড়ার টনটনায়নেও ধরা যাউক আমরা 'ক' পাইতেছি–তাহা হইলে উভয় ক্ষেত্রেই স্নায়বিক আলোড়নের সমতা লক্ষ্য করিয়া মহাকাব্যের বিষয় হিসাবে উভয় বেদনার মূল্য এক ধরা যাইতে পারে এবং স্নায়ুর রিল্যাক্সেশন ভ্যালু খতাইয়া চুম্বন ও পুল্টিসের পার্থক্যও আমরা সহজেই দূর করিতে পারি। সত্য কথা বলিতে কি, এই এনার্জেটিক্সের শাণিত ফলকের আঘাতে র‍্যাফেলের মুরাল পেন্টিং ও শ্যামুর বুড়ি পিসির ঘুঁটে দেওয়ার মধ্যে যে আভিজাত্য–বিষ–জর্জ্জরিত ব্যবধান সৃষ্ট হইয়াছে তাহা অবাধে ধরাসাৎ করা যাইতে পারে। ওহো, সাম্যধর্ম্মের পতাকা এবার আর আমরা কোথায় প্রোথিত করিতে না পারিব! ভাবিলে রোমাঞ্চ হয়।

যে মূর্খ বলিয়াছিল, "তৃষ্ণায় ছাতি ফাটে চাহিলাম এক ঘটি জল; তাড়াতাড়ি এনে দিল আধখানা বেল।" সে ছন্দবিদের পক্ষ লইয়া ছন্দ–বিরোধীর প্রতি শ্লেষ জ্ঞাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। ইহা অমার্জ্জনীয় অপরাধ; কারণ ছন্দ ও ছন্দহীনতা উভয়ের মধ্যে দিয়াই সমান এনার্জি ব্যয়িত হইতে পারে। কিন্তু তাহার আরও অধিক অমার্জ্জনীয় অপরাধ হইতেছে জল ও বেলের মধ্যে ভেদাভেদ সৃজন করা। রাধাকমল বাবু সাক্ষী দিবেন যে আধখানা বেল পাওয়া তাহার পক্ষে সম্ভবত অনাধিকার–প্রাপ্তি। কেননা এক ঘটি জল কল খুলিয়া আনিলেই হয়। বেল সরবরাহের জন্য গাছে উঠিতে হয় অর্থাৎ তাহা অনেক অধিক এনার্জি সাপেক্ষ।

(এখানে Relativity–এর জন্য একটি বিরাট ক্ষেত্র অনধিকৃত অকর্ষিত অবস্থায় পড়িয়া আছে। যথা বেল সরবরাহক যদি ন্যাড়া হয় তাহা হইলে তাহার এনার্জি হয়ত আরো বেশী খরচ হইবে–ইত্যাদি।)

গ্রেশাম্স্ ল

রাণী এলিজাবেথের আমলে স্যার টমাস গ্রেশাম নামক একজন অর্থনীতিবিদ্ মন্ত্রী বলিয়াছিলেন যে খারাপ টাকার ঠেলাতে ভাল টাকা বাজার হইতে বাহির হইয়া যায়। অর্থাৎ বাজারে মেকীর চলন হইতে সুরু হইলে, সকলেই ভাল টাকাগুলি পকেটস্থ করিয়া মেকীগুলি চালাইবার চেষ্টা করে। ফলে অচিরাৎ বাজারে, শুধু মেকীই চলিতে থাকে, ভাল মুদ্রাগুলি বাজার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া সিন্দুক ও থলিতে স্থান লাভ করে।

সাহিত্যের বাজারেও মেকি চলিতে আরম্ভ করিলে উৎকৃষ্ট জিনিষকে পেনসন লইতে হয়। Bad literature drives out good literature, এই সত্যের মূলেও সেই চলনের ও লাভের কথা। খারাপ সাহিত্য (বা চিত্র) চালাইবার লাভ বেশী হয়। যেমন মেকী–টাকা প্রস্তুত–কারক তাহার টাকা–"চালককে" টাকা সস্তায় দিতে পারে তেমনি নিকৃষ্ট সাহিত্য–বিক্রেতাও অধিক কমিশন লাভে এনার্জ্জায়িত হইয়া সবেগে কুসাহিত্য চালাইয়া ফেরে। তারপর এইরূপ বহু কমিশনভোগীর সংঘীভূত প্রচেষ্টায় মানুষ ক্রমেই সাহিত্যরস–বোধহৃত হইয়া গঞ্জিকা, অহিফেন অথবা কোকেইন অ্যাডিক্টের ন্যায় এইরূপ সাহিত্যের অ্যাডিক্ট হইয়া দাঁড়ায়। এবং আফিং–খোরকে যেমন তেঁতুল, অথবা দ্রাক্ষারস সেবীকে সুপক্ক দ্রাক্ষাফল বিক্রয় করা যায় না, তেমনি এই অ্যাডিক্ট ক্লিষ্ট সাহিত্যের হাটে সুসাহিত্য এনার্জ্জি–প্রসূত হওয়া সত্ত্বেও অবিক্রীত পড়িয়া নষ্ট হয়।

ল অফ ডিমিনিশিং ইউটিলিটি

ইহা অর্থশাস্ত্রের আর একটি সূত্র। এই সূত্রমতে কোন দ্রব্য অধিক জমিলে তাঁহার চাহিদা কমিয়া যাইতে আরম্ভ করে। যথা যাহার তৃষ্ণায় নিবৃত্তির জন্য জলবিন্দু মাত্রেরও সাশ্রয় নাই তাহার নিকট জলের মূল্য অনন্ত। কিন্তু যে জলে ডুবিয়া মরিতেছে তাহার নিকট জলের আদর খুবই কম। এই নিয়ম অনুসারে বর্ত্তমানে কালিদাস, হোমার, লাওৎসিউ এর যুগ হইতে রবীন্দ্রনাথ, রোমা রোলা ও লিয়াং চি চাও এর যুগ অবধি সঞ্চিত সুসাহিত্য–আধিক্যের ফলে মানুষ আর সুসাহিত্য চায় না। চায় নর্দ্দমার বর্ণনা, কবিতায় ভ্রূণহত্যা ও মহাকাব্যে নীলামী ইস্তাহার। তাই আজ পন্ডিত কুলচূড়ামণি–রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় সাহিত্যে এই নব চাহিদার বাণী উচ্চারণ করিয়া 'ল অফ ডিমিনিশিং' ইউটিলিটির সম্মান সংরক্ষণ করিতেছেন। আমরা শুধু বলিতে চাই, এই 'ল এর জয় হউক। আমরা বাঁচিয়া বাঁচিয়া, লজ্জা নিবারণ করিয়া করিয়া, মাতৃগর্ভে জন্মিয়া জন্মিয়া, পায়ে হাঁটিয়া হাঁটিয়া, ও শরীরে মল–লেপন না করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। অর্থনীতির জয় হউক–আমরা রাধা কমলিত কটাক্ষে–নূতন আশার সূর্য্যের পানে একবার চাই চাহিতে–চক্ষু খুলিয়া নহে কারণ তাহাতে আমরা চিরঅভ্যস্ত, চক্ষু, মুদিয়া চাহিলেই ল অফ ডিমিনিশিং ইউটিলিটির সম্মান রক্ষা হয়।

রিজিওনালীজম্

কথাটির অর্থ স্থানমাহাত্ম্য। ব্যাপারটি এই যে বহুকাল পূর্ব্বে কয়েকজন পাশ্চাত্য অর্থশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি আবিষ্কার করেন যে, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে যে, কোন কোনটি কোন কোন বিশেষ স্থানে অতিরিক্তরূপে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে তাহার মূল কারণ স্থানমাহাত্ম্য। ইহাতে ডারউইনিজমের প্রভাব লক্ষিত হয়। যেন

স্থানগুণাবলী দ্বারা অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বাছাই হইয়া স্থানের সহিত সামঞ্জস্যে শ্রেষ্ঠতমেরই জয় হইতেছে। এই চিন্তার ধারা অনুসরণ করিয়া এদেশেও কেহ কেহ আবিষ্কার করিয়া ফেলেন যে কয়লার খনি যে স্থলে নাই সেখানে কয়লার ব্যবসা ভাল চলে না এবং মরুভূমিতে মৎস্য অথবা পাটের ব্যবসা বা আবাদ উত্তমরূপে সম্পন্ন হয় না।

আজকাল সাহিত্যেও রিজিওনালিজমের অভ্যুদয় হইয়াছে। অর্থাৎ কিনা, স্থান-বিশেষের সাহিত্য যদি ক্লোরা ও ফনা এবং পারিপার্শ্বিককে অবজ্ঞা করিয়া শুধু কল্পনা বা অন্তর-ক্ষেত্রকে আশ্রয় করিয়া বাড়িয়া উঠিতে চায় তাহা হইলে রিজিওনালিজমের ন্যাচুরাল (?) সিলেক্‌শান তাহার অচিরাৎ মুন্ডপাত করিবে। সাহিত্য যদি বাঁচিতে চায় তাহা হইলে তাহাকে স্থানমাহাত্ম্য বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে। এই পাট-পচানো দেশে শুধু পাট লইয়া যদি কেহ কাব্য রচনা না করিতে পারেন তাহা হইলে অন্ততঃ তাহাকে পচানো যায় এরূপ কিছু লইয়া চলিতে হইবে-অর্থাৎ সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে সাহিত্যের সহিত পাটের সম্বন্ধ রক্ষা করিতেই হইবে। মানুষের জীবনটাকে অশ্রুজলে চোবাইয়া বর্ষপ্লাবিত পাটের ফসলের ন্যায়ই বর্দ্ধনশীল করিয়া তুলিতে হইবে। তারপর তাহাকে পচাইয়া থেঁতলাইয়া ও আছড়াইয়া, সাহিত্যজাল বুননের উপযুক্ত করিয়া তুলিতে হইবে। ইহা আর্টের কথা। ভোগের দিক দিয়া দেখিলেও জীবনের সকল ভোগের মধ্যে পাটশাকের লালাবহুল হড়হড়ে ভাব আনিয়া ফেলিতে হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এই রিজিওন্যালিজ্‌ম সহজ জিনিস নয়। ইহার মধ্যে আমরা ভাগনারের অর্কেস্ট্রার, স্বরসমন্বয় প্রচেষ্টার যেন একটা বিভিন্নরূপ দেখিতে পাইতেছি। তাই-

> কবিতা আমরা লিখি জুট-মিলী ছন্দে,
> শিহরিয়া উঠি শত সুয়ারের* গন্ধে-
> গাড়ী ঘড় ঘড় ট্রাম ঢং ঢং কত যে
> হৃদয়ে জাগায় ভাবরাশি অবিরত যে!
> কয়লার কালি, বারবনিতার ভঙ্গী
> কাদা নর্দমা সবে হল চির সঙ্গী।
> বস্তির কোলে আস্তাকুঁড়ের ঢলিমা,
> বাণী, শোন্‌ সুখে তোরে সেই কথা বলিমা।

তৎপরে শহুরে সাহিত্যিক শহরের যত অলিগলি, ডাস্টবীন, আস্তাকুঁড়, বস্তি, চালা, ভাইটাল ষ্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্‌, গোরস্থান, মৃতদাহ-ঘাট, গণিকালয়, চোরের আড্ডা, চীনাটাউন, হাতুড়ের চিকিৎসা, পচা চপকাটলেট, দুর্গন্ধ ভেতো হোটেল, ও বাজার দর, ড্রেনেজ, স্যানিটেশন, আতুরালয়, বাতুলালয় ইত্যাদি নানাবিধ রিজিওন্যাল সংগ্রহনিচয়ে বাণীর বাণীর খোল একেবারে ঠাসিয়া ঠুসিয়া বোঝাই করিয়া টইটম্বুর করিয়া তোলেন-বাণী গুরুভোজনে ভারবাহী বালকের ন্যায় নিস্তব্ধ নিঃসাড়।

ধন্য রিজিওন্যালিজ্‌ম্‌। তোমার দৌলতেই আজ আমরা অতীতের মাধবীকুন্ডতে, পিক-কুহরণ, শিখীর নৃত্য, আমরণ প্রণয়, সুদূরের পিয়াসা, সোহ্‌রাব রোস্তাম, শকুন্তলা, বেহুলা, রোমীও জুলিয়েট, ট্রয়, হস্তিনাপুর, ইন্দ্রপ্রস্থ দুর্গেশনন্দিনী, জাঁ ভালজাঁ, গোরা, বিমলা, চিত্রাঙ্গদা প্রমুখ ন্যাকামী পশ্চাতে ফেলিয়া সম্মুখে সাহিত্যগগনে নব সাহিত্যের লেলিহানলালসাগুন প্রতিচ্ছায়া দেখিয়া অকালসন্ধ্যাভ্রমে সাহিত্যের হাটে নিজ নিজ তল্পিতল্পা গুটাইতে সুরু করিয়াছি।

ডারউইনিজ্‌ম ও সারভাইভ্যাল অফ দি ফিটেষ্ট

এই রিজিওন্যালিজমের মূলে যে ডারউইনের উপরোক্ত থিওরী ব্যতীত আর কিছুই নাই তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মানুষের সকল প্রচেষ্টা যেন বরবেশে সভায় উপস্থিত, পারিপার্শ্বিকা দেবী স্বয়ম্ভরা হইবেন বলিয়া। তিনি যে কাহাকে বরণ করিবেন তাহা নিছক (absolute) শ্রেষ্ঠতা দেখিয়া বিচার হইবে না; তাঁহার মন জোগাইয়া চলিতে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা সক্ষম হইবেন তিনিই দেবীর মাল্য কন্ঠে পাইবেন। অর্থাৎ দেবী যদি নগ্নতার পক্ষপাতী হন তাহা হইলে হবুবরের দর্জ্জির খরচ বাড়াইয়া কোন লাভ নাই। দেবী যদি বেহাগ খাম্বাজ কিম্বা ধানশ্রী মালশ্রী পছন্দ না করেন এবং বেহারী চালায় একঘেয়ে সুরে 'ক্রীড়া মে কাটা আ আ আ' জাতীয় কিছু শ্রবণেই মুগ্ধা হন, তাহা হইলে উচ্চ সঙ্গীত আওড়াইয়াও কোন লাভ নাই। এই রূপে দেবী অনায়াসেই ব্যঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ তাচ্ছিল্য করিয়া প্লীহাগ্রস্ত ভুঁড়োপেট পছন্দ করিতে পারেন; কুসুম-মালঞ্চ বর্জ্জন করিয়া মালফিউরেটেড হাইড্রোজেন আত্মসমর্পণ করিতে পারেন; বেদনা ছাড়িয়া ভুট্টাভক্ষণেই প্রীত হইতে পারেন; এবং মাংসপেশীর বিস্তারণ অপেক্ষা বিস্ফোটক কিম্বা আবের দ্বারাই অধিক আকৃষ্ট হইতে পারেন। আসল কথা এই যে ডারউইনিজমে Survival হইবে fittest এর- best এর নহে। সুতরাং পারিপার্শ্বিকা দেবীকে যিনি অধিক খুশী করিতে পারিবেন তাঁহারই জয়।

অধুনা, সাহিত্যে সেই কারণে যাঁহারা বর্ত্তমান জগতের অবস্থা বুঝিয়া কলম চালাইবেন রাধাকমল বাবুর মতে তাঁহাদেরই দাবী সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইবে সাহিত্যের বাজারে। এই পারর্সনাল ও সোশ্যাল হাইজীনের যুগে প্রাণের রিয়েলিজম উপবাসে প্রাণত্যাগ করিবে-সারভাইভ করিবে দেহের (vene ?)realism. চিত্রকর রামধনু কিম্বা অস্তগামী সূর্য্যালোক না আঁকিয়া আঁকিবে আমেরিকান কায়দায় বাথরুমের অপূর্ব্ব স্যানিটারী ফিটিংস। শস্যক্ষেত্রে বাতাস ঢেউ খেলিয়া যাতায়াত করিলে চলিবে না, চাই চিলিয়ান নাইট্রেট অথবা সুপারফস্ফেটের ঢেউ; কেননা তাহাই সার কথা। ডারউইনিজ্‌ম সাহিত্য ও আর্টের সিংহাসনেও aesthetics কে তাড়াইয়া expendiency কে অভিষিক্ত করিবে। 'যুগ-ধর্ম্ম', বলিব আর কি?

নিও ম্যালথুজিয়ানিজম

সবকথাতেই রাধাকমল বাবুর কাছে হারিয়া গিয়া শেষ কথাটা তাহাকে একবার ভাল করিয়া খোঁচা দিয়া জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করে-'মশায়, যদি সাহিত্যের ভূত ভবিষ্যৎ এমন করিয়াই আয়ত্ত করিয়াছেন, তবে গোটা দশবারো নাটক নভেল মহাকাব্য লিখিয়া ফেলুন না কেন?' কিন্তু হয়, খোঁচা যথাস্থানে পৌঁছাইবে না! পন্ডিত মহাশয় নিশ্চই উত্তর দিবেন, 'রে মূর্খ, জানিস না কি বর্ত্তমান সুপ্রজননবিজ্ঞানের মূল সূত্র হইতেছে নিও ম্যালথুজিয়ানিজম ওরফে জনন-দমন? আমি এই সূত্রকেই তাহার লজিক্যাল একস্ট্রীমে টানিয়া লইয়াছি-কিছুই লিখিব না-সাহিত্যের স্বাস্থ্যের দিক দিয়া লেখন দমনই 'পন্থা।' হার মানিতেই হইবে! যদি পুনর্ব্বার কোমর বাঁধিয়া আগুয়ান হই ও প্রশ্ন করি,' 'তবে এত গুলি অর্থনীতির কেতাব লিখিলেন কেন? উহাতে ত সুপ্রজনন-নীতি মানিয়া চলা হয় নাই।' হয়ত শুনিব, 'ও সব কি আমার সন্তান? ও হইতেছে মৎপরিচালিত থিওরীর অনাথ-আশ্রম। যে সকল থিওরীর মা-বাপ নাই-তাহারা শুধু ওখানে আমার কৃপায় দুটি খাইয়া দাইয়া

বাঁচিয়া আছে (এবং vice versa)। ইহার মধ্যেই আমি অর্থনীতির আদিমতম সত্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছি।' আর কিছু জানিবার নাই। শুধু আছে মনের সাবকনসাশ গহ্বরে একটা আবছা স্বপ্নছবি.......

ঐ দেখ সম্মুখে সাহিত্য-ভারত-ভূমি ছেতরাইয়া চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে। তাহার বক্ষ ছাইয়া শত লক্ষ সাহিত্যিক থিওডোলাইট, গজফিতা, লেভেল ও অন্যান্য জরিপের যন্ত্রপাতি লইয়া realism এর অভিনব জরিপের কার্যে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া পড়িয়াছে। ফারটিলিটির নিয়ম অনুসারে ভারতীয় সা...ত্যের সাবসয়েল ক্রমে উপরে উৎক্ষেপণ করিয়া সাহিত্য-ফসলের সারবত্তা উত্তরোত্তর বাড়ান হইতেছে।

ঐ দেখ ন্যাকামীর সাহিত্য, যাহা গগনচুম্বী অনন্তরত্নপ্রভব হিমাল-য়ের মতই ভারত-সাহিত্যকে জগত সাহিত্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে, আজ উদীয়মান রিয়েলিজম-অগস্ত্য দেবের পদে লুটাইয়া সুদূর গোবি অবধি পথ ভারতীয় সাহিত্যের সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। নব সাহিত্যের জ্যোতি কুয়াশার মত হিমাচলকেও ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।

ঐ দেখ নব নব কালিদাসের আবির্ভাব। কুমারসম্ভব -শেষে-ঋতুসংহার সাধনে সেই অতীতের কালিদাস নিজ ন্যাকামীর চরম পরিণতি দেখাইয়াছিল। আজ ঋতু-সংহারে নব কালিদাসের সাধনার আরম্ভ এবং মহান্ কুমার-অসম্ভব কাব্যেই তাহার নিওম্যালথুজিয়ান পরিণতি। শিবের চক্ষে আর উমার রূপচ্ছায়া প্রতিহত হইয়া অসুর-সভায় কড়কাপাত করিবে না। শিব আজ নব অনুপ্রাণনায় অনুপ্রাণিত হইয়া নন্দী-ভৃঙ্গীর সোক্রাটিক প্রেমেই-মশগুল।

রাধাকমল ধন্য। কেননা শুধু তাঁহারই মিডিয়েশনের ফলে আমরা আজ দিব্যদৃষ্টিতে ভবিষ্যতের এ বিদ্যুৎ সঞ্চারিনী ছবি দেখিতে পাইলাম। □

শনিবারের চিঠি,

অগ্রহায়ণ

১৩৩৪

কারচুপি চলছে, চলবে

নিজস্ব প্রতিনিধি

নির্বাচনে কারচুপি হতে পারে প্রতিটি স্টেজে। ভোটার তালিকা তৈরির সময়, প্রিসাইডিং ও পোলিং অফিসার নির্বাচনের সময়, ভোট গ্রহণের সময় এবং ভোট গণনার সময় – প্রতিটি ক্ষেত্রে কারচুপি সম্ভব।

ভোটার তালিকায় যথেষ্ট ভুয়া ভোটারের নাম লিপিবদ্ধ করা কঠিন নয়। বিশেষ করে শাসক দলের পক্ষে। ভুয়া এবং অনুপস্থিত অথবা অন্য ভোটারের নামে একটি ভোট দেওয়াও অসম্ভব নয়। ধরা পড়লে শাস্তির ভয় নেই। কট্টর সমর্থককে প্রিসাইডিং অথবা পোলিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ করাও কঠিন কিছু নয়। বিশেষ করে শাসক দলের পক্ষে। এঁরা তৎপর হলে অনেক কিছু করতে পারেন। বিশেষ করে পোলিং অফিসাররা যদি একই দলের হন। বুথে দলীয় কর্মীদের একাধিপত্য থাকলে বুথ জাম করা হয়। তখন আইনি আর বে-আইনিতে কোন ব্যবধান থাকে না। ভোট গ্রহণের সময় প্রকৃত ভোটারকেও বাধা দেওয়া যায়। রেশন কার্ড আনতে ফেরৎ পাঠানো বে-আইনি হলেও অবাধে চলছেই। ভোট গণনার সময়েও এদিক-ওদিক করা সম্ভব। হয়েও থাকে।

ভোটার তালিকা রচনার সময় মানিকতলা কেন্দ্রের ভোটারদের নাম বেলগাছিয়া কেন্দ্রে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। দেওয়া হয়েও থাকে। এক দলের দুর্গে অন্য দলের ভোটারদের নাম থাকলে আগে ভাগে তাদের ভোট ফেলে দেওয়া যেতে পারে। দেওয়া হয়। ভোট কেন্দ্রগুলোতে ব্যালট পেপার পৌঁছনোর কথা ভোটপর্ব শুরু হবার আধ ঘণ্টা আগে। কিন্তু পৌঁছয় তিন থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টা আগে। অসৎ কর্মচারীদের অসৎ কাজের জন্য যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়। কালি ভালভাবে লেপ্টে দেবার কথা। অনেক সময় শুধু ছুঁইয়ে দেওয়া হয়। সাদা দুধ ভেজানো দেশলাই কাঠি ঘঁষলেই সামান্য কালি উঠে যায়। তখন আবার ভোট দেওয়া যায়। ভুয়া ভোটার চ্যালেঞ্জ করতে হলে ভোটার পিছু দুটাকা জমা দেবার কথা। নিয়মটি মেনে চললে সরকারি তহবিলে অনেক টাকা জমা পড়ত। কিন্তু দলের টান অথবা ভয় – যে কারণেই হোক, চ্যালেঞ্জ না করতে এজেন্টদের উৎসাহিত করা হয়। ফলে ভুয়া ভোটে বাধা দেবার কেউ থাকে না।

ভোট গণনার সময় টেবিল সাজানো হয় ছক অনুযায়ী। ভোট গ্রহণের কাজে যদিবা অন্যেরা সুযোগ পেয়েও যান, গণনার সময় কর্মীদের বাছাই করা হয় নানা ভাবে। শাসক দলের উগ্র সমর্থক নন, এমন কর্মীর ভোট গণনার ডিউটি পাওয়া অসম্ভব।

ব্যালট বাকস খুলে ব্যালট পেপারের যে বান্ডিল বাঁধা হয়, তার প্রত্যেকটিতে ৫০টি থাকবার কথা। প্রার্থীর দিকে তাকিয়ে বান্ডিল বাঁধা হয় ৪০ থেকে ৪৫ আর ৬০ থেকে ৭০ ব্যালট পেপার দিয়ে। একজন প্রার্থীর পক্ষে দেওয়া ব্যালট পেপার অন্যের বান্ডিলে ঢুকিয়ে দেবার অভিযোগও উঠেছে। এসব কারণেই বারবার রি-কাউনটিং-এর দাবি ওঠে।

অমর ভট্টাচার্য বনাম লক্ষ্মী সেনের লড়াইয়ের ভোট গণনা শুরু হয়েছিল সকাল ৭টায়। রাত দশটায় ফলাফল ঘোষিত হয়। এক টানা পনের ঘণ্টা গণনা চলে। অমর ভট্টাচার্যের কর্মীরা সজাগ এবং তৎপর না থাকলে, বারবার রি-কাউন্টিং দাবি না করলে ফলাফল হয়তো অন্য রকমের হয়ে যেত! এই কেন্দ্রে ব্যালট পেপার বাতিল হয়েছে যথেচ্ছ ভাবে – এ ব্যাপারে কোন আপীল চলে না। ছাপ মারার কথা প্রতীক চিহ্নের পাশে যে লম্বা দাগ থাকে, তার মাঝখানে ছাপ মারার কথা। অনেকে এদিক-ওদিক ছাপ দিয়ে বসেন। নির্বাচনী আইন অনুযায়ী খানিকটা এদিক-ওদিক হলে কিছু হবার কথা নয়। কিন্তু আইন যে সরকারি কর্মচারীদের অবাধ ক্ষমতা দিয়েছে। তাঁরা কত কৌশলই না জানেন। হ্যাঁকে না করা তাঁদের পক্ষে আদৌ কঠিন নয়। □

রঙীন ফাঁস

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

শনিবারের চিঠিতে তারাশঙ্করের আবির্ভাব 'হাবু-শর্মা' ছদ্মনামে, কয়েকটি ছোটগল্পের রচয়িতা-রূপে। 'রঙীন ফাঁস' শনিবারের চিঠিতে তারাশঙ্করের প্রথম গল্প, ভাদ্র ১৩৪০ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত হয়েছিল। এই গল্পটি এযাবৎ কোনও গ্রন্থে বা গ্রন্থাবলীতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এজন্য এর একটি বিশেষ মূল্য আছে। এর আগে তারাশঙ্করের কয়েকটি মাত্র গল্প বিভিন্ন পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। 'রঙীন ফাঁস' এ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হল।

হোক গে কালো। জীবনে যখন কাল্পনিক ছাড়া বাস্তবের কোন মেয়েই আমার কাছে ঘেঁষে এল না তখন মন্দাই আমার ভাল। না হোক সে যোয়ান-অব-আর্ক, না চড়ুক সে ঘোড়ায়, তবু সে হাল ফ্যাশানে বেড় দিয়ে কাপড় পরে, স্বদেশী মেলায় ভলেন্টিয়ারিও করে বেড়ায়। না হোক চেহারা সুশ্রী—কিন্তু বয়সের রূপটা তো আছে। সেইটাই হবে না হয় আমার জীবনের পাথেয়। মন্দাকে নিয়ে ঢুকলাম চিত্রার পাশের রেস্তোঁরাটায়। হাতে ছিল খানিকটে রঙীন সুতো। চিরাচরিত প্রথায় নরনারীর বন্ধনকে আমি ঘৃণা করি। মনে করেছিলাম চা কফি তারপর আরও উত্তেজক কিছু খাইয়ে মোহময় গল্প বলতে বলতে তাকে জয় করে এই সুতোয় তাকে বাঁধব। তারপর অন্ধকার রাত্রে সমস্ত আলো নিভিয়ে দিয়ে তাকে নিয়ে উড়ব—পরিব্যাপ্ত আকাশ, নীল দিগন্তবিলীন মহাসাগর, মহাশূন্য ব্যোমপথে। যদি পথে হিতোপদেশের কচ্ছপের মতো পড়ি—আমি নিশ্চয় জানি, আমি মরব না—মহাপ্রস্থানের পথ হতে আমি ফিরে আসতে জানি। যাক—

রেস্তোঁরায় বসে মন্দাকে বললাম, শোন মন্দা—আমার লীলা দিদির কথা তোমায় বলি শোন,—শেষ তাঁকে দেখেছি আমি একটা গলির মোড়ে ফিটফাট পরিচ্ছদে গা ঢেকে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছেন—

মন্দা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, তাহলে তোমাদের ফ্যামিলিটা তো ভাল নয় অবোধচন্দ্র!

—না না—চমকে ওঠোনা—সে আমার আত্মীয় কেউ নয়। তবে দিদি বলতাম—পরের বাড়ির মেয়ে কিনা তাই স্বচ্ছন্দে—বুঝলে কিনা। তারপর আর একজনের কথা বলি শোন—তার কথা আমার ফুরোয় না মন্দা। তাকে নিয়ে গল্প আমি লিখব না। সে ভদ্র সমাজের জঞ্জালের বালতি। সে তীর্থ পথেও প্রেম করে। নারীর ক্ষুধা তার মিটল না—মিটবে না—

মন্দা চায়ের পেয়ালাটা টেবিলের ওপর নামিয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে ফিক্ করে হেসে বললে, বেড়ে ন্যাকামি করে কথা বলতে পার ভাই তুমি! সে তো তুমি নিজে।

চমকে উঠলাম—ভাবলাম মন্দা জানলো কেমন করে! কথাটা চাপা দেওয়াই ভাল বুঝে চাপা দিলাম—বললাম—না। তার কথা মনে হলেও আমি স্নান করি। সে পাপের সৃষ্টি। বোধহয় পূর্ব-জন্মে সে কালীঘাটের হাড়িকাঠে প্রাণ দিয়েছিল।

মন্দা বললে, এ জন্মেও দিত। কিন্তু খুঁতো-পাঁঠায় বলি হয় না বলে সে বেঁচে গেছে।

আমি গম্ভীরভাবে বললাম, সে কি বলে জান? বলে, পরের সম্পত্তি বলে পরস্ত্রীর প্রতি যারা তাকায় না—তারা নারীকে অপমান করে।

মন্দা হেসে বললে, কিন্তু আড়চোখে চোরা-চাউনিতে দেখো। নইলে বেত কিংবা জুতো তোমায় খেতে হবে এ নিশ্চয় জেনো। আজকাল প্রত্যেক মেয়ের পায়ে জুতো থাকে জানো তো?

এবার ন্যাকামির চরম করলাম। বললাম, না তার কথা আর বলব না। কোন দিন তাকে নিয়ে গল্পও লিখব না। তাকে নিয়ে গল্প লিখলে সাহিত্যে আমায় অমর হয়ে থাকতে হবে। সে আমি পারব না।

আমার গালে একটা ঠোনা দিয়ে মন্দা বললে, এটা তুমি খুব ভাল বলেছ—খুব সুস্থ মস্তিষ্কের লক্ষণ দেখিয়েছ। কারণ তুমি অমর হলে বাংলা দেশে মড়ক লেগে যাবে সাহিত্যের ভয়ে সব আত্মহত্যা করবে। বুড়ো বাপমায়ে তো করবেই, কারণ ছেলেরা সবাই সাহিত্যিক হতে চাইবে। ইন্দু, বেলা, পার্বতীর দেশে তো অভাব নেই। আর যে রকম তুমি তাদের ঠিকানা দিচ্ছ।

আমি তবু দমলাম না—দমসে কাজ হাসিল হবে না। জয়-মাল্য গলায় উঠবে না। বলে গেলাম, ভাল সরু গলায় কথাটা তোমায় বলি শোন মন্দা। সুন্দর সাপের মতো তার দেহখানি এঁকেবেঁকে হিল-হিল করছে—

মন্দা যেন হাসতে হাসতে চুরমার হয়ে ভেঙে কাত হয়ে পড়ল। তার পেয়ালার গরম চা আমার গায়ে চলকে পড়ে গেল। যন্ত্রণায় চোখে জল এল। কিন্তু কোথায় আলু-বাটা? মন্দা নিতান্ত অনাত্মীয়ার মতো বললে, তোকে দংশন করে সে শেষ করে দেয়নি কেন? তা'হলে বাংলা দেশের একটা উপকার হত।

গম্ভীরভাবে বললাম, হেসো না মন্দা। কল্পনার রং চড়িয়ে এগুলিকে মনোহারি করে বলতে তোমায় পারতাম। সে করতে গেলে ভুল হবে আমার; ব্যাকরণ—বানান অনেক কিছু ভুল হবে। অধ্যয়নের পান্ডিত্য নিয়ে যারা গল্প লেখে তারা যশ পায় সন্দেহ নেই—কিন্তু তা অপযশ।

মন্দাও গম্ভীরভাবে বললে, শেয়ালটাও তাই ঠিক বলেছিল—দ্রাক্ষাফলে রস আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তা অম্লরস।

মন্দার তীক্ষ্ণ উত্তরে ভয়ে ও অসহায়তায় আমার সর্বশরীর জমাট হয়ে আসছিল। কম্পিতকণ্ঠে বললাম—

তোমাকে আমি পতিতা নারীর গল্প

বলতে বসিনি। ভাষার লালিত্যে পতিতা নারীর চরিত্র অংকন যারা করে, তারা সমাজদ্রোহী, অতি ঘৃণ্য জীব তারা—

মন্দা চোখ দুটো উজ্জ্বল করে বললে, ঠিক বলেছিস। এই জন্যেই লোকে তোকে বাড়ি ঢুকতে দেয় না।

পরাজয় আমি মানব না। মাথায় লাঠি মারলেও না। ওকে আমার জয় করা চাই। বললাম, তবে শোন মন্দা, সেই আসানসোলের কথাটা—মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মন্দা বললে—মোকামা পর্যন্ত যেবার সেই—একটি ভদ্রঘরের মেয়ের কিছু পিছু গিয়েছিলি, সেই বারের কথা তো? সে আমি শুনেছি। কিন্তু একটা কথা আমায় লুকিয়েছিলি ভাই! যখন তুই নেবে যাস, তখন পা থেকে একপাটি জুতো খুলে—

মন্দা আবার হেসে ভেঙে পড়ল।

চমকিত হয়ে বললাম, কে বললে?

মন্দা চা কফি গরম উত্তেজক পানীয় পান করছিল। মুখে তার সে পানীয়ের গন্ধ পাচ্ছিলাম। সে বললে—

টিকিট কালেক্টার। হারীনদা সেদিন তাকে আমার ঘরে এনেছিল কিনা-লোকটার সংগে কাশীর স্টলে আলাপ, সে বললে। শুনেই বুঝলাম—এ তুই ছাড়া কেউ নয়!

হা হা করে মন্দা হেসে উঠল।

আমার কাঁদতে ইচ্ছা করছিল। নেশা করলে এতক্ষণ বোধহয় কেঁদেই ফেলতাম।

এবার বড় কথা বলতে শুরু করলাম। কতকটা প্রলাপের মতো শোনাবে, তা শোনাক। কিন্তু আমি যে বড় কথা জানি, সে কথাটাও তো জানানো দরকার।

ট্রটস্কি, বার্কেনহেড, উইন্টারটন—এদের এবারের খবরটা জান মন্দা?

মন্দা স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলে। বুঝলাম ওষুধ ধরেছে। আরও একটা নাম ঝেড়ে দিলাম।

বার্নার্ড শ কিন্তু—

আমার নাক চেপে ধরে মন্দা বলল, চুপ কর ভাই। তোর মুখে সব সহ্য হয়। এইগুলো বাদে। কেন নিজেই নিজেকে গর্দভ প্রমাণ করবি। জানিস তো ভতাবৎ শোতে, বলে আর-একটা হাসি।

হাতের রঙীন সুতোটা সে কেড়ে নিয়েছিল, সেটায় পাক দিতে দিতে উঠে পড়ে বলল, চললাম।

আমি উপুড় হয়ে তার পা চেপে ধরলাম। বললাম, আমার কি আছে? দিব্যি করে আগে বলো আমায় ছেড়ে কোথাও যাবে না? তোমার আর কি—একটার বদলে আর একটা। আমার—

আমি হাপুস নয়নে কেঁদে উঠলাম। বললাম, ছেড়ে যেয়ো না মন্দা। ষোল বছর বয়স থেকে পথে-ঘাটে যেখানে যাকে দেখেছি—বুঝেছ কিনা,-কিন্তু—

মন্দা খিল খিল করে হেসে বললে, জেঠীমা ঠিক কথাই বলে। তোর মতন ছেলেকে নুন গিলিয়ে মারা উচিত ছিল।

মেয়ের ছোঁয়া পেয়ে গায়ে দশ হস্তীর বল এল। পা-দুটো মন্দার চেপে ধরলাম। মন্দা তার পায়ের জুতোর ডগাটা আমার মুখে গুঁজে দিয়ে বললে, কাশীর মিষ্টি খা, না-না, খেতেই হবে। জোর করে আমি মুখে গুঁজে দেব বলে দিচ্ছি।

হাত-পা আমার কাঁপছিল। তবু মেঠাই মুখে দিতে হল। সন্দেশের তেজে গায়ে যেন জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে। বোবা হয়ে নিজের জায়গায় এসে বসলাম। মন্দার হাসি আর থামে না। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। সে আমার সেই রঙীন সুতোটা ফিরিয়ে দিয়ে বললে, এই নে, তোর রঙীন সুতো। বেড়ে ফাঁস বানিয়ে দিয়েছি। লোকের গলায় লাগিয়ে একটান মারবি। চেতনা হরে এলেই পকেট থেকে দেড়টাকা গেঁড়া মারবি, বুঝলি?

সে হাসতে হাসতে চলে গেল।

এতক্ষণে মনটা আমার খুশীতে ভরে গেল। প্রেম না হোক, পয়সা উপার্জনের উপায় আমায় মন্দা দিয়ে গেছে। রঙীন সুতো হাতে করে কলরব করতে করতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম।

মণিকোঠা থেকে মুখ বাড়িয়ে কবি বললেন, লোকটা অসুস্থচিত্ত। কিন্তু কলরব করার ক্ষমতা আছে।

রাস্তার মাঝেই আমি ধেই ধেই করে নাচতে শুরু করে দিলাম। যাঃ গেল—কাপড়টা খসে যায় যে!-যাক।

হাবু শর্মা

শনিবারের চিঠি, ভাদ্র ১৩৪০

রেকর্ড আর রেকর্ড

এত ভোট কখনও পড়েনি। ভোট গণনার সময়ও কখনও এত মানুষকে দেখা যায়নি। এত ভোটার বাদ-পড়েনি কখনও। ভোটের মুখে এত লোককে কখনও গ্রেপ্তার করাও হয়নি। এমনভাবে আইনকে কখনও বুড়ো আঙুল দেখান হয়নি। এবারের নির্বাচন সব দিক থেকেই রেকর্ড। অনিলবরণ, দিলীপ ঘোষ, চণ্ডী ঘোষ এবং অমিত ঘোষের ছবিগুলো এই রেকর্ডের কথাই বলবে। □

ভোট দিচ্ছেন কমল বসুর মা, আশা বসু। বয়স এখন ৮০।

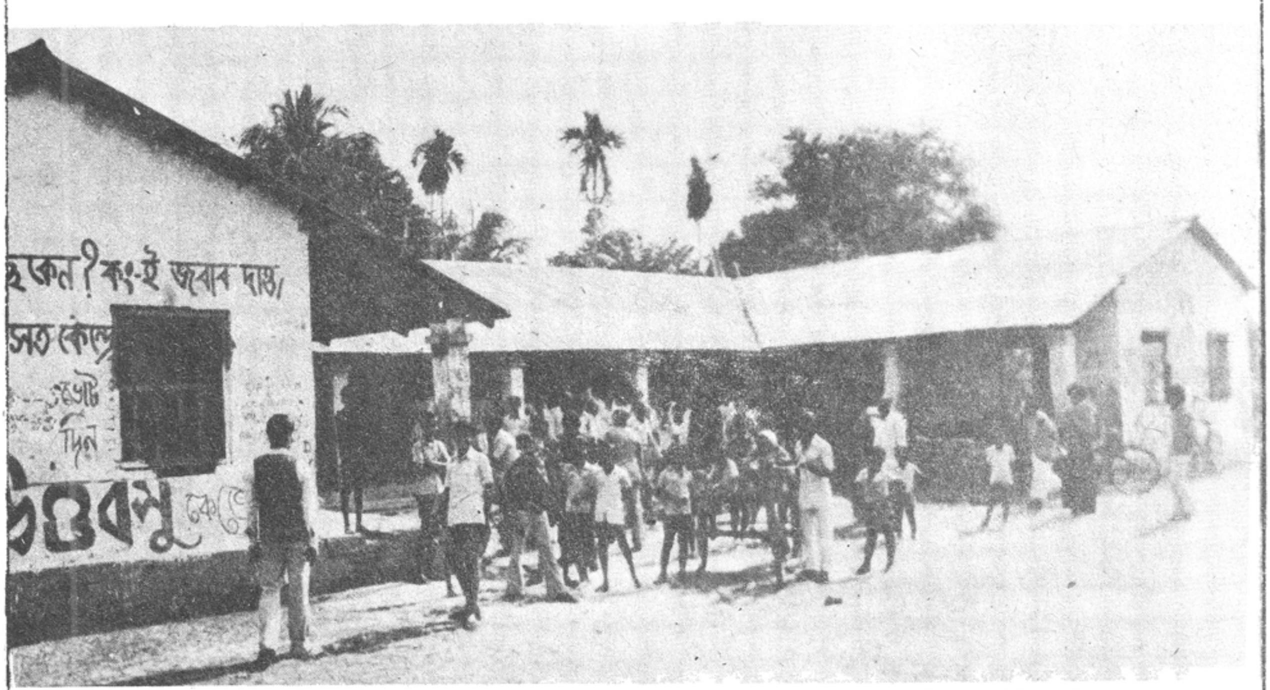

বুথের বাইরে প্রার্থীর প্রচার নিষিদ্ধ। কিন্তু এবার সে সব মানা হয়নি। বারাসাতের গণদীপায়ন স্কুল কেন্দ্রের ছবি।

মালদায় নিজের কেন্দ্রে ভোট দিচ্ছেন বরকত গনি খাঁন চৌধুরী।

বাংলা দেশের ভিতরে

না জেনে সোমবার দুপুরে বাংলাদেশের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলাম। বনগাঁর বয়ড়া সীমান্তে মামা-ভাগ্নে গ্রামের একটি টুকরো পড়ে গেছে বাংলাদেশের দৌলতপুর গ্রামে। ওখানকার তিনটি পরিবার তাদের ষোলটি ভোটই দিয়েছেন।

মামা-ভাগ্নে গ্রামের বি এস এফ ফাঁড়িতে কিছুক্ষণ ছিলাম। তারপর এগিয়ে যাই। মজা একটা খালের পাড় বরাবর রাস্তা। এই খালের ওপারেই বাংলাদেশ। ও পারে মাঠে কাজ করছিলেন নিজামত। ডাকতেই কাস্তে হাতে করে লুঙ্গিপরা তরুণটি এগিয়ে এলেন। আমিও কিছুটা এগিয়ে গেলাম। জানতে চাইলাম, এবারের ভোটের কথা কিছু জানেন? জবাব ঃ জানব না কেন? কংগ্রেস আর সি পি এম-এ লড়াই হচ্ছে। প্রশ্ন ঃ আপনাদের নির্বাচন কবে হবে? জবাব ঃ আমি এরশাদের পার্টির সমর্থক। কিন্তু তিনি তো গদি ছাড়তে রাজি নন। আওয়ামি লিগ এরশাদকে মসনদে রেখে নির্বাচনে নামবে না। জোর তাঁদেরই বেশি।

বি এস এফ-এর দুই জওয়ান ছুটতে ছুটতে এগিয়ে এলেন। বললেন, আপনি বাংলাদেশের ভিতরে ঢুকে পড়েছেন। বি ডি আর যদি গুলি করত! তাকিয়ে দেখলাম, নিজামত হাওয়া হয়ে গেছেন। □

অজিত চক্রবর্তী

মরজি মহল

বনফুল

।। ২৪ মার্চ, ১৯৭৫।।

কালকের চড়া রোদের প্রতিক্রিয়া হয়েছে আজ। সকাল থেকেই মেঘলা। আমাদের বাংলা কাগজের প্রথম পৃষ্ঠার খবর পঁচিশ হাজার ছেলে পরীক্ষায় টোকাটুকি করেছে। ট্রেনে ডাকাতি, বাসে ছিনতাই হয়েছে। শ্রী নাহার বলেছেন আমি দল ভাঙতে চাইছি না, সত্য-উদ্ঘাটন করবার চেষ্টা করছি। কিন্তু সত্য উদ্ঘাটন করলে সব যে ফরদাফাঁই হয়ে যাবে। রাজনীতির পথ কি সত্য-সন্ধানের পথ? শ্রী নাহার বিজ্ঞান, সাহিত্য, বা ধর্মের পথে আসছেন কেন? পায়খানায় কেউ পুষ্প-সন্ধান করতে যায় না।

কাল সন্ধ্যায় শ্রী তারাপদ সাউ মশায়ের নিমন্ত্রণে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে গিয়েছিলাম 'সাউ বাড়ির গান' শুনতে। সেখানে সুনীতিবাবুর সঙ্গে দেখা হল। গান খুব ভালো লাগল। বিশেষত তাঁর নাতনীর কথ্থক নাচটি। যিনি কথ্থকের বোল বলছিলেন তাঁর গলা মিষ্টি তো নয়ই, কর্কশ। সে জন্য মাঝে মাঝে রস-ভঙ্গ হচ্ছিল। 'সাউ বাড়ির গানের' বিশেষত্ব এই যে তারাপদ সাউ মশাই (বয়স ৭০) স্বয়ং গান করেন এবং তাঁর পরিবারের সকলেই গান করে ছেলে মেয়ে বউরা, নাতি নাতনীরা— সবাই।

।। ২৫ মার্চ, ১৯৭৫।।

কাগজের খবর কংগ্রেস শাসিত যে গভর্নমেন্টের পুলিশ একজন কংগ্রেসী এম. এল. এর বাড়িতে চড়াও হয়ে মারপিট করেছে জগদ্দলে। একজন যুবক গুলিতে মারা গেছে। বেহারের ভাষায় বলতে হলে বলতে হয় 'হায়রে দাদা এ কি ভৈল শ্বশুরাকে লোটা শাস চোরাইল। কাকের মাংস শুনেছি কাকে খায় না' কিন্তু এখন দেখছি খায়।

তবে খবরের কাগজের খবর বিশ্বাসযোগ্য নয়। কালই হয়তো খবর বেরোবে, পুলিশ নয় ডাকাতে হামলা করেছিল। দুটো মোক্ষম খবরের প্রতিবাদ বেরিয়েছে। মুজিবে ভাসানিতে না কি কোলাকুল হয় নি আর নাহার যে মিলিটারি ম্যাপ পাচারের খবর দিয়েছিলেন সেটা না কি মিথ্যা।

হরি হে, বল কি করি
বেড়াও কেন এমন ভাবে নানা বেশ ধরি
কভু নারী কভু নর
কভু অর্দ্ধনারীশ্বর
সত্য হরি কভু তুমি
কখনও বা মিথ্যা হরি
হরি হে, বল কি করি
খাদ্য তুমি খাদক তুমি
বাজনা তুমি বাদক তুমি
ভেদবুদ্ধি নিয়ে মোরা
হোঁচট খেয়ে মরি
হরি হে, বল কি করি।

চৌরঙ্গী এলাকা থেকে বে-আইনী হকাররা বিতাড়িত হয়েছেন। তারা কিন্তু যাবে কোথা?

।। ২৬ মার্চ, ১৯৭৫।।

আজ বড় খবর সৌদি আরবের কর্তা ফায়জাল মারা গেছেন। মুসলমানদের ঐতিহ্য অনুযায়ীই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর ভাইপো তাঁকে গুলি করে মেরেছেন। ওঁরা বহু পেট্রোলের মালিক। পেট্রোলেই ওঁদের মেজাজ অভিষিক্ত। একটুতেই দপ করে জ্বলে ওঠে। আগুনের ফুলকিটা কোথা থেকে কেন পড়ল তা ঠিক জানা যায় নি। সবাই বলছেন ভাইপোটা পাগল ছিলেন। জানি না রাশিয়া বা আমেরিকা এর সঙ্গে জড়িত কি না। কিন্তু এই তুই করছিস কি—

শলা দিয়ে মুড়ি খাস
সুক্তো দিয়ে ভাত
তুই কেন ভেবে মরিস
শাহানশার বাত
শাহানশা যাক শাহানুশা
তুই ভাত মুড়ি খা।

।। ২৭ মার্চ, ১৯৭৫।।

ছড়া

আজ দোল
সেজেছে সব সং
লাল রং কম
অধিকাংশই দেখছি
কালচে কালচে রং
বিজয় নাহার দিল্লী গিয়ে
বেশ কিছু দল জুটিয়ে
রব তুলেছেন বন্দেমাতরম্।
খালি না কি থাকবে না রে
বিহারের টং
মেশিরজি ফুলিয়ে গলা
করবে বকবকম্।

বাড়ির পাশেই মাইক গর্জাচ্ছিল। তারপর শ্লোগান দিতে দিতে একটা মিছিল এল। তারপর ভীষণ আওয়াজ করে দাঁড়াল একটা 'বাস'। অন্য পাশের মাঠে ছেলেরা খেলার নামে হল্লা করছিল অনেকক্ষণ থেকে। ভগবান আমার ডাক শুনে এসেছিলেন। অপেক্ষা করছিলেন আমি কি বলি তা শোনার জন্য। কিন্তু সঙেগ সঙেগ রেডিও যখন গর্জন করে উঠল–'আকা–শ বানী কলকাতা—খবর পড়ছি—'

ভগবানের ধৈর্য্যও শেষ হল। তিনি অন্তর্ধান করলেন।

।। ২৮ মার্চ, ১৯৭৫।।

বল না কি করি হে
গান যায় গড়িয়ে
ছড়া যায় ছড়িয়ে
অফিসের বাবুরা
    যান তড়বড়িয়ে
বুড়োবুড়ি দুজনেই
    চলে নড়বড়িয়ে
মোটরটা পাশ দিয়ে
    যায় ধড়ফড়িয়ে
মাছের মাথাটা রোজ
    খান কড়মড়িয়ে
এমন লোক তো আর
    মেলেনাইক হরি হে।
বল না কি করি হে—

আজ কাগজ নেই। ঘুঘুর ডাক শুনে ছাতে বেরিয়ে ঘুঘুর দেখা পেলাম। দেখলাম এক জোড়া বুলবুলি ইলেকট্রিক তারের উপর লাফালাফি করছে আর এমন একটা সুরে ডাকছে যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। মনে হল ওরা প্রণয়লীলায় মত্ত।

।। ২৯ মার্চ, ১৯৭৫।।

শিবাম্বু (মানে পেচ্ছাপ) না কি সর্ব্বরোগ–হর। নিজের পেচ্ছাপ গেলাস গেলাস খাও নীরোগ থাকবে। পড়লাম শান্তি ভট্টাচার্য মশায়ের লেখা একটা পুস্তিকায়। পেটের মধ্যেই সর্বরোগ–হর ওষুধ রয়েছে, বিনা পয়সায় যত খুশী পাওয়া যাবে,তা না ব্যবহার করে আমরা তাহলে দুর্মূল্য চিকিৎসা কেনবার জন্য ডাক্তারদের বাড়িতে কিউ দিচ্ছি কেন?

অনেকে মনে করেন তিলাকুচো কিম্বা উচ্ছের রস খেলে বহুমূত্র সেরে যায়। বিজ্ঞানের ধোপে কিন্তু এ গুজব টেঁকে নি। 'ডায়াবিনিস্' এবং 'ইনস্টুলিন' টিকে গেছে। সাধারণ বুদ্ধিতে একটা কথা মনে হয় যে মূত্র পান করলে বা মালিশ করলে আমার অসুখ সেরে যাবে সে মূত্র তো আমার শরীরেই ছিল তখন অসুখ সারায় নি কেন? মূত্রাশয়ের মূত্র পাকাশয়ে গেলে বা চামড়ার ভিরে ঢুকলে ভিন্ন ফল দেবে? এ বিষয়ে গবেষণা হওয়া দরকার। Vein থেকে রক্ত নিয়ে Intramuscular injection দিয়ে অনেক সময় বেতোরোগীর বাতের ব্যথা কমে। এ চিকিৎসা স্বীকৃতি পেয়েছে বিজ্ঞানে। শিবাম্বু সম্বন্ধেও গবেষণা হওয়া উচিত। শুধু গুজব বা অবৈজ্ঞানিকের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করা যায় না।

।। ৩০ মার্চ, ১৯৭৫।।

ওড়িশাতেও (মানে উড়িষ্যাতেও) জয়প্রকাশ নারায়নের আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছে। পশ্চিমবঙগও জানে যে বর্তমান সরকার দুর্নীতিপূর্ণ কিন্তু তবু সে জয়–প্রকাশ–বিরোধী, কারণ গড্ডলিকার মতো এক–নায়কের অনুসরণ করবার প্রবৃত্তি তাদের নেই। তাদের বিরোধী দলরাও নানা ভাগে বিভক্ত।

প্রত্যেকেই স্বাধীন তারা
নিজেকে নিয়ে আত্মহারা।

কাল থেকে বেশ চড়ারোদ উঠেছে। বৈশাখি একেবারে চড়চড়িয়ে দেবে। পাখীরা নীরব হয়ে গেছে। গোলাপ গাছগুলো ভাজা ভাজা হচ্ছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও এই রৌদ্ররসের একটা সৌন্দর্য আছে। সেটাও উপভোগ করছি।

।। ৩১ মার্চ, ১৯৭৫।।

কাগজে দেখলাম ওড়িষ্যায় একলক্ষ লোকের সামনে জয়প্রকাশ নারায়ন বক্তৃতা করেছেন যে দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করাই এখন আমাদের একমাত্র কাজ। ইন্দিরাজীর 'গরীবী হটাও' অভিযান ব্যর্থ হয়েছে। ইন্দিরাজী জনমতের কণ্ঠরোধ করে গণতন্ত্রের মূলনীতিরই কণ্ঠরোধ করছেন এখন।

কয়েকজন কংগ্রেসী কালো—পতাকা নিয়ে আর ইটপাটকেল ছুঁড়ে জয়প্রকাশকে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল। কংগ্রেস গভর্নমেন্টের পুলিশই তাদের উপর লাঠি চার্জ করেছে। জয়প্রকাশ নারায়নের গায়ে হাত দেবার সাহস গভর্নমেন্টের নেই।

অনেকে বলছেন বর্তমান গভর্নমেন্ট ভেঙে দিয়ে জয়প্রকাশ তার বদলে কি করবেন খোলসা করে বলছেন না। তাঁর কোন পার্টিও নেই। তাহলে কি করবেন তিনি?

এর উত্তর জয়প্রকাশ গভর্নমেন্ট ভাঙছেন না। গভর্নমেন্ট কুশাসনের ঘায়ে আপনি ভেঙে যাচ্ছে। জয়প্রকাশ উপলক্ষ। জয়প্রকাশ নির্য্যাতিত জনগণের প্রতিবাদ। আমার ভয় তাঁর দলেও বহু বদ লোক জুটছে দেখে।

।। ১ এপ্রিল, ১৯৭৫।।

আজ জয়প্রকাশ নারায়নের কলকাতায় আসার কথা। যাঁরা সিদ্ধার্থ–ভক্ত ইন্দিরা–সেবক তাঁরা নাকি কালোপতাকা দেখিয়ে জয়প্রকাশকে তাঁদের বিরূপতা প্রদর্শন করবেন। ভক্তির আতিশয্যে এ–ও তাঁরা ঠিক করেছেন যে তাঁরা ট্রাম এবং বাসেও কালো পতাকা লাগাবেন। কলেজ–স্কোয়ার অঞ্চল নিষ্প্রদীপ করে দেবেন। ভক্তির আতিশয্য হলে সবই সম্ভব। তবে এ দেখে যারা হাসবে তাদের হাসি বন্ধ

করতে পারবেন না। তাঁরা জয়প্রকাশ নারায়ন শুনেছি অহিংস ব্যাঘ্র, অতি ভক্তির কুশাঙ্কুর তিনি গ্রাহ্য করবেন কি?

শ্রদ্ধা ভক্তি লাভ করে ধন্য হল নিমাই
খুলে গেল সংসারের বেড়ি
তাকে নকল করতে গিয়ে
দেশ সুদ্ধ লোক
মাল পো খেয়ে হল নেড়ানেড়ি
বাজিয়ে খোল করছে গোল
চ্যাংড়া ছোঁড়াছুঁড়ি
প্রেমের নামে চলছে খালি
কামের হুড়াহুড়ি।
একটি কথা কিম্বদন্তী
বলল সারাক্ষণ
জেনে রেখো অতি-ভক্তি
চোরের লক্ষণ।

।। ২ এপ্রিল, ১৯৭৫।।

এরোড্রোমে কাল জয়প্রকাশ নারায়ণকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছেন কলকাতার লোকেরা। কালো পতাকা-ওলারা আসর জমাতে পারে নি। জয় প্রকাশ নারায়ণ কাল যে সব কথা বলেছেন তার মধ্যে নিম্নলিখিত চারটি উক্তি প্রধান যোগ্য।

(১) তিনি বলেছেন যে ইন্দিরাজীর পায়ের তলা থেকে মাটি ক্রমশ সরে যাচ্ছে। পুলিশ দিয়ে বা সৈন্য দিয়ে তা ঠেকানো যাবে না।

(২) সোভিয়েটের সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্ব হয়েছে—খুব ভালো কথা। কিন্তু সে বন্ধুত্ব বজায় রাখবার জন্য সি. পি. আইয়ের (C.P.I.) সঙ্গে হাত মেলানোর প্রয়োজন নেই। সোভিয়েত-ভারত-মৈত্রীর প্রবর্তক পন্ডিত জহরলাল নেহরু C.P.I. কে অনেকদিন আমলই দেন নি-Ban করেছিলেন।

(৩) উড়িষ্যার দশজন ব্যবহারজীবী জয়প্রকাশকে যে স্মারকলিপি দিয়েছেন তাতে আছে যে নন্দিনী সৎপথী অসৎপথী হয়েছেন। Corruption-এর কলঙ্কে তিনিও কলঙ্কিত।

(৪) বিজু পট্টনায়কের নামে কোন দুর্নীতি প্রমাণিত হয় নি। তিনি পারাদ্বীপের জন্য নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করেছিলেন, নিজের স্বার্থের জন্য নয়। এ রকম ক্ষমতার অপব্যবহার বিধান রায় ও জহরলালও করেছিলেন। এটা বে-আইনী হলেও খুব দোষাবহ নয়।

।। ৩ এপ্রিল, ১৯৭৫।।

কাল কংগ্রেসী ও সি-পি-আই গুন্ডারা হৈ-হল্লা করে ইট ছুঁড়ে গালাগালি দিয়ে জয়প্রকাশ নারায়নকে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে বক্তৃতা দিতে দেয় নি।

বাংলা দেশের পোড়ামুখ আরও পুড়ে গেল বোঝা গেল তারা ভীতু, সত্য কথা শোনবার সাহস বা ধৈর্য্য তাদের

নেই। প্রমাণিত হল তারাই ফ্যাসিস্ট, জয়প্রকাশ নন। জয়প্রকাশ বলেছেন—গুন্ডাদের চ্যালেঞ্জ আমি গ্রহণ করলাম। ওই ইউনিভার্সিটি ইন্‌সটিটিউটে এসে আমি আবার বক্তৃতা দেব।

গুন্ডারা যখন গুন্ডামি করছিল তখন পুলিশরা দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল সংয়ের মত। গুন্ডাদের বাধা দেবার চেষ্টা করে নি। না করাটাই স্বাভাবিক কারণ সিদ্ধার্থশঙ্কর হোম মিনিস্টার এখন। এবং সুব্রতবাবু প্রসেশনের পুরোভাগে ছিলেন।

সত্যকে গুন্ডামি দিয়ে ঠেকানো যায় না। এ কথা ইতিহাসে বারবার প্রমাণিত হয়েছে। আবার হবে। এই গুন্ডামির প্রতিক্রিয়া অনেক বাঙালী ছেলেমেয়েদের জয়প্রকাশের পতাকা-তলে সমবেত করবে। সুস্থ আদর্শবাদী ছেলেমেয়ে এদেশে এখনও অনেক আছে। কিন্তু কি হাস্যকর ব্যাপার হল কাল। ওরা তর্কে হেরে গিয়ে শেষে ওকে কামড়ে দিল।

।। ৪ এপ্রিল, ১৯৭৫ ।।

আজকের কাগজে যা পড়লুম তাতে মনে হল শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী এবার সত্যিই পাকা রাজনৈতিক খলিফা হয়েছেন। কালকের ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটের ঘটনায় তাঁদের যে হাত ছিল একথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে গেছেন তিনি। স্টেটসম্যানের খবর—He said in Calcutta on Thursday that members of the Youth Congress and the Chhatra Parishad did not disrupt Joy Prokash Narayan's meeting —তাঁর মতে জয়প্রকাশ নারায়ণ চলে গিয়েছিলেন কারণ মীটিং–এ নাকি শ্রোতাই ছিল না। আর তাঁর ট্রেন ধরার তাড়া ছিল।

বাঃ বাঃ।

আনন্দবাজারে দেখছি–তিনিই বলেছেন–'দেড় বছর ধরে' ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে অরাজনৈতিক গণ–আন্দোলন গড়ে তোলার নামে তিনি যে রাজনীতি গড়ে তুলেছেন তিনি তাঁর বিরুদ্ধে।

আজকাল রাজনীতিই সব রকম ভ্রষ্টাচারের উৎস। তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হলে সেটাকে অরাজনৈতিক হতেই হবে। কারণ বিষ্ঠা দিয়ে বিষ্ঠা পরিষ্কার করা যায় না।

প্রিয়রঞ্জনের বিবর্তন দেখে অবাক হলাম।

।। ৫ এপ্রিল, ১৯৭৫ ।।

কাল বিকেলে বেলঘরিয়ায় Indian Medical Association–এর বার্ষিক উৎসবে প্রধান অতিথি হয়ে গিয়েছিলাম। তাঁরা আমাকে মানপত্র দিয়ে সম্বর্ধনা জানালেন, অনেক ভালো ভালো কথা বললেন আমার সম্বন্ধে। শুনে মনে একটু সুড়সুড়ি লাগল। কিন্তু বিবেক তখনই সাবধান করে দিয়ে বলল—তুই নির্বিকার দর্শক থাক। মনে বিকার জাগলেই কারো না কারো শিকার হয়ে পড়বি। তাই থাকবার চেষ্টা করছি।আজ বিকেলে 'ভোলা ময়রা' থিয়েটার দেখতে যাব।

জয়প্রকাশকে অপমান করে পশ্চিমবঙ্গ একটা মস্ত বড় ভুল করেছে। এর প্রতিশোধ যদি অন্য প্রদেশবাসী নেয় তাহলে পশ্চিমবঙ্গের নেতাদের পক্ষে সেটা সুখকর হবে না। সমর গুহ এ নিয়ে লোকসভায় আন্দোলন করছেন। কৃষ্ণকান্ত যা বলেছেন তার সারমর্ম হচ্ছে—

ওরে ওরে বাঙালী
  কোন পথে তুই হাঁটছিস?
যে ডালটায় বসে আছিস
  সেই ডালটাই কাটছিস?
যুক্ত–ফ্রন্টকে হটিয়ে
  নিজেই তোরা গুন্ডা হলি শেষটা
জনগণের আদালতে
  খারাপ হয়ে যাচ্ছে তোর Case–টা!

।। ৬ এপ্রিল, ১৯৭৫ ।।

ছড়া–১
গফুর হল কাৎ
তার পিঁড়েতে বসল জগন্নাথ।
  ২
ক্ষীর আমাকে খেতেই হবে
  ক্ষীরের হাঁড়ি আমার হাতে
তোমরা যদি ছুটে এসে
  ভাগ বসাতে চাও গো তাতে
বাধা আমি দেবই দেব
  আঁচড়ে কামড়ে যেমন পারি
হয়তো সে আচরণটা
  হবে Unparliamentary
হোক হোক পরোয়া নাই
  ক্ষীর আমার চাইই চাই।

আজ কাগজে দেখে খুশী হলাম যে শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন ঘোষণা করেছেন যে পশ্চিমবাংলাতেও নবনির্মাণ সমিতি গঠিত হচ্ছে এবং তাতে CPI(M) থাকবে না। CPI(M) সহিংস পন্থায় বিশ্বাসী, নবনির্মাণ সমিতি গান্ধী–পন্থী। আগামী ১০ এপ্রিল তাঁরা জয়প্রকাশ নারায়ণের উপর হামলার প্রতিবাদে একটি মৌন মিছিল বার করবেন।

গরম কিন্তু ক্রমশ বাড়ছে। আমার নাতনী তিস্তাও ক্রমশ বেশ দামাল হয়ে উঠছে। ঘুমুতে চায় না, দুধ খেলে বমি করে ফেলে। তার ইচ্ছে অর্জুন তাকে নিয়ে ক্রমাগত বেড়িয়ে বেড়াক।

।। ৭ এপ্রিল, ১৯৭৫ ।।

যেখানে অসদুপায়ে ভোট জোগাড় করা যায় সেখানে গণতন্ত্র জঘণ্যতন্ত্র হয়ে যায়। সেখানে একনায়কত্ব ভালো, নায়কটি যদি সৎ এবং স্বদেশ প্রেমিক হন। মুশকিল হয়েছে সোনার পাথরবাটি দুর্লভ। গণতন্ত্র এবং একনায়কত্ব কোনটাই সর্বাঙ্গসুন্দর নয়। গণতন্ত্রটাই অবশ্য আধুনিক মানবসমাজের ফ্যাশান। যেমন ফ্যাশান প্যান্ট আর হাফশার্ট। ফ্যাশানের দাবী না মেনে উপায় নেই। সুতরাং গণতন্ত্র মানতে হবে আপাতত।

সরকারি অফিসে যে জনগণ সর্বদা নাজেহাল হন–এ সত্য অনেকদিনকার। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নজর এতদিনে তার উপর পড়েছে দেখে সুখী হলাম। আমলাতন্ত্রে ঘুম এবং 'Push' অনেকদিন থেকে চলছে–সেটা 'হুস' করে উড়ে যাবে কি? শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পারবেন?

মোরারজি আমরণ অনশন শুরু করলেন আজ থেকে। জয়প্রকাশ বলেছেন–Emergency will result in total dictatorship Emergency অর্থে তিনি বলেছেন–Emergency আইনগুলি। কাগজে দেখলাম সিদ্ধার্থশংকর জয়প্রকাশের উপর হামলা—হওয়াতে দু:খিত। সত্যি তিনি ভদ্রলোক।

ধারাবাহিক

স্মাগলারদের মধুচক্রে

আই এ এস আই পি এস সি পি এম

বিশেষ সংবাদদাতা

সি পি এমের একটি প্রভাবশালী অংশকে সোনার হরিণে পেয়েছে। এই অংশটি শেষ পর্যন্ত একটি চোরাই চালান চক্রের সংগে হাত মিলিয়েছে। এই চক্রের চাঁইরা নেপাল থেকে চোরা পথে এদেশে সোনা পাচার করে। সোনা ছাড়াও ঘড়ি চরস গাঁজাও ওরা চোরাগোপ্তা নিয়ে আসে কলকাতায়। এদের সদর দপ্তর দক্ষিণ কলকাতার এক ফ্ল্যাট বাড়ি। বাবা ও তিন ভাই– এই চোরাই পাচার চক্রের নায়ক। এদের সংগে গাঁটছড়ায় বাঁধা পড়েছেন কয়েকজন আই পি এস এবং আই এ এস। এঁদের কথা পরে বলছি। আগে বিপ্লবী জননেতাদের কথা শুনুন।

যে চক্রের কথা বলছি সেই চক্রের সদর কলকাতায় হলেও মহাকেন্দ্র রয়েছে নেপাল, ব্যাংকক এবং হংকংএ। নেপালে একটি প্রথমশ্রেণীর হোটেলও এরা চালায়। চক্রের সংগে রয়েছে কয়েক ডজন সুন্দরী যুবতী। কলকাতার সাহেব পাড়ার দুটি ফিরিঙ্গি হোটেলে এদের নিশিবাসর বসে। সেই আসরে চলে মদ, জুয়া আর মেয়ে মানুষকে নিয়ে কারবার। এখানেই আসেন কয়েকজন বিপ্লবী জননেতা এবং আমলারা। সম্প্রতি সি বি আই এবং শুল্ক অফিসাররা স্মাগলারদের গোপন আস্তানায় হানা দিয়ে যে সব অশালীন ফটো পেয়েছে–সেগুলির মধ্যে আছে ঐ সব ভি আই পিদেরও ফটো। এই জননায়কদের মধ্যে একজন খেলাধুলা, স্টেডিয়াম নিয়েই ব্যস্ত। আর একজন সচিবালয়ের কর্মী যাঁর দাপটে–আমলারা পর্যন্ত সবসময় তটস্থ থাকেন। এদের অশোভন ও আপত্তিকর ছবি পাওয়া গেছে চোরাচালানদারদের ডেরায়। এই চক্রের চাঁইদের জাল হংকঙের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে। সেখানে রয়েছে বুলেট প্রুফ গাড়ি। সি পি এমের সহযোগী নেতারা যখন চীন সফরে যান তখন তাঁরা হংকংএ বিশ্রাম করে যান। ঐ বুলেটপ্রুফ গাড়িতে তাঁরা হংকঙের বাজারঘাট করেন, শহর ঘুরে বেড়ান। হোটেলে নিখরচায় খানাপিনা করেন। হোটেলের খানাপিনার খরচাখরচ সবকিছুই ঐ চক্রের চাঁইরা মিটিয়ে দেয়। এরা দাগি স্মাগলার। কফেপোসায় জেলখানা আসামী এরা। এদের সংগে ছবি রয়েছে এরাজ্যের এক কান্ডারির। আর একজন ভি আই পিরও ফটো রয়েছে। তবে তিনি গত হয়েছেন। কিন্তু তিনিও যখন চীনে গিয়েছিলেন তখন মাঝপথে হংকংএ ঐ স্মাগলারদের আতিথ্যে নিখরচায় খানাপিনা করেছিলেন। স্মাগলারদের সংগে এই ঘনিষ্ঠ মেলামেশার জন্য সি পি এমের এক মহল ক্ষুব্ধ। এই বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী বয়সে তরুণ। জ্যোতি বিরোধী বলেই পরিচিত। সম্প্রতি সি পি এমের– সম্পাদকীয় মন্ডলীর বৈঠকে এ নিয়ে জোর ঝড় বয়ে যায়। এরা দাবি করেন সোনাপাচারকারীদের সংগে সব সম্পর্ক ত্যাগ করতে হবে। জ্যোতি বাবু অবশ্য বলেন, হ্যাঁ, ওরা যে স্মাগলার তা কী করে জানব। ওরা তো দলের পৃষ্ঠপোষক বলেই জানতাম। দুই নম্বরী কাজ কারবার সম্পর্কে আমাদের জানা ছিল না। এটাও কেন্দ্রের চক্রান্ত হতে পারে। তদন্ত করে দেখা দরকার।

গোয়েন্দা পুলিশ এ সম্পর্কে একটা তদন্ত করেও ছিল। কিন্তু না তার রিপোর্ট প্রকাশ করা হয় নি। আর হবেই বা কী করে। প্রকাশ করলে ঘায়েল হতেন পুলিশের কয়েকজন বড়কর্তা। এই চক্রের দক্ষিণ কলকাতার বাড়িতে একজন আই পি এস অফিসারের ছেলে থাকত। তিনি কলকাতা পুলিশের ডি সি। কলকাতায় বদলি হবার আগে তিনি ছিলেন জেলায়। তাঁর ছেলে পড়তো সাহেবি স্কুলে। ছেলের অসুবিধা যাতে না হয় সেজন্য ঐ ডিসি ওদের বাড়িতে রেখে দিয়েছিলেন। আর একজন এম পির ছেলের হাঁপানির ওষুধ ঐ চোরাই চালান চক্রের চাঁইরা চোরাপথে আমেরিকা থেকে এনে দিত। আর একজন পদস্থ প্রাক্তন সি আই ডি অফিসার ঐ চক্রের গাড়িতে করে নেপালের মোটর দৌড়ের সামিল হন। হ্যা বলতে ভুলে গেছি এই চোরাই চালানচক্রের লোকেরা সোনাদানা পাচার করা ছাড়াও বিদেশে এদেশী সাপের চামড়া চোরা চালান করতো। ঐ আই পি এস অফিসার তা জানা সত্ত্বেও সেই গাড়ি চেপে নেপালে পাড়ি দিয়েছিলেন, ছিলেন ওদেরই হোটেলে। ওদেরই পয়সা চলেছিল খানা পিনা। মদ ও মেয়েমানুষের নেশায় ঘুম পাড়িয়ে এই চক্র দুই জন আই এ এস অফিসারের কাছ থেকে পারমিট যোগাড় করে দিয়েছে। এদের খপ্পরে পড়ে কয়েকজন তাবড় শুল্ক অফিসার নাস্তানাবুদ হয়েছেন। এক শুল্ক কালেকটারের স্ত্রী আত্মহত্যা করে জ্বালা জুড়িয়েছেন। এক শুল্ক কালেকটার নিজেই আত্মঘাতী হয়ে স্ত্রীকে শান্তি ও সান্ত্বনা দিয়ে গেলেন। এই কালেকটরের নাম তপন লাহিড়ি। এর আত্মহত্যার পরেই এই চোরাই চালান চক্রের চাঁইদের মুখোশ খুলে পড়ে। বছর পাঁচেক আগে 'প্রেসিডেন্সি কলেজের কৃতী ছাত্র তপন লাহিড়ি যখন কলকাতায় শুল্ক গোয়েন্দা বিভাগের উপ-অধিকর্তা তখন সাপের চামড়ার চোরাচালানের দায়ে এই চক্রকে ধরেন। সেই থেকে এদের সংগে তপন বাবুর ঘনিষ্ঠতা জন্মায়। এর পর চলতিবছরের মাঝামাঝি দমদমে সাত লাখ টাকার ঘড়ি পাচার করতে গিয়ে ঐ চক্রের দুই চাঁই শুল্ক অফিসারদের হাতে ধরা পড়ে। এরা দমদম বিমানবন্দরের গ্রীন চ্যানেল দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছিল। এরা স্বামী স্ত্রী। ব্যাংকক থেকে আসছিল। তপনবাবু এদের গ্রীন চ্যানেল দিয়ে পার করতে সাহায্য করেন। লাহিড়ি সাহেব তখন বম্বের আপিল বিভাগের শুল্ক কালেকটর। ধরা পড়ে ঐ দম্পতি বলে এর আগেও আরো কয়েকবার এই ভাবেই ওরা লাখ লাখ টাকার চোরাই মাল পাচার করেছে। লাহিড়ি সাহেবের সাহায্যে। তারপর তলব গেয়ে শুল্ক সাহেব বাড়িতে ছোটেন।

দিল্লির বড় বাঘা বাঘা অফিসাররা তাঁকে সামরিক বরখাস্তের হুমকি দেন। হেনস্তার ভয়ে তপন বাবু বিয়ারের সংগে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন। এ হেন চোরাই চালান চক্রকে মদত দিয়েছে সি পি এম পার্টির একটি দুষ্ট চক্র। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এ সম্পর্কে তদন্ত করছেন। তল্লাসি চালিয়ে জরুরি কাগজপত্র, চিঠিপত্র, ফটো উদ্ধার হয়েছে। মাঝপথে থেমে না গেলে ধরা পড়বে কিছু রাঘব বোয়াল। মুখোশ খুলে পড়বে বাম রাজনীতির কয়েকজন অতি প্রয়োজনীয় ব্যক্তির। □

সংবাদ বিসংবাদ

১৬ অকটোবর, ১৯৮৪, রাজ্য সরকারের চিফ সেক্রেটারি এস ভি কৃষ্ণাণ যে সারকুলারটি (১০৬৭০-এফ) দেন, তার কথা এতদিনে তিনি নিশ্চয়ই ভুলে গেছেন। কৃষ্ণাণ এই সারকুলারে জানিয়েছিলেন, রাজ্য সরকারের সকল অফিসে কাজের সময় হল সকাল সাড়ে দশটা থেকে বেলা সাড়ে পাঁচটা। মাঝে দুপুর দুটো থেকে আড়াইটে টিফিন ব্রেক। এই টিফিন ব্রেকের সময়টার অপব্যবহার করা হচ্ছে – এ রকম খবর এসেছে। টিফিন ব্রেক টিফিন খাবার জন্যই। এই সময়ে যদি মিটিং করার প্রয়োজন দেখা দেয় টিফিন ব্রেকের পর তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া চলবে না। চিৎকার, শ্লোগান কিংবা বিক্ষোভ জানানোর জন্য যেন অফিসের স্বাভাবিক কাজ ব্যহত না হয়। দেখা গেছে, টিফিন ব্রেকের আধ ঘণ্টার পরও সভা চলেছে। কোন অবস্থাতেই এর অনুমতি দেওয়া যেতে পারে না। সরকারি কর্মচারীদের সরকারি অফিসে উচিত আবহাওয়া বজায় রাখতে যত্নবান হওয়া উচিত।

মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার আর একটি সার্কুলারে জানিয়েছিলেন, কোন সরকারি কর্মচারী যেন নির্বাচনে কোন দলের হয়ে নির্বাচনে না নামেন। পরে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অফিসার জানান, সরকারি কর্মচারী কোন দলের হয়ে নির্বাচনী প্রচারে যোগ দিলে তার বিরুদ্ধে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ঐ তিনটে সারকুলারের একটিরও কোন মূল্য নেই। কো-অর্ডিনেশন মানেন না, অতএব ফেডারেশনও পরোয়া করেন না। অন্য জায়গার কথা বাদ দিন, খোদ রাইটার্সেই কো-অর্ডিনেশনের নির্বাচনী সভা হয়ে গেছে। মাইক্রোফোনে বক্তৃতা হয়েছে, মুখ্য নির্বাচনী অফিসারের না জানবার কথা নয়। ফেডারেশন এই কো-অর্ডিনেশনী নির্বাচনী সভার কথা নির্বাচন কমিশন, নির্বাচন অফিসার, মুখ্য সচিব প্রমুখ অনেককেই জানিয়েছেন। ফল কিছুই হয়নি। ফলে ফেডারেশনও কংগ্রেসের সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারে নেমেছে। ফেডারেশনের কিছু পোস্টার নজরে পড়ছেও।

ফেডারেশনের অভিযোগ, তাঁদের সদস্যদের বাদ দিয়ে বেছে বেছে কো-অর্ডিনেশনের সদস্যদের নির্বাচনের কাজে নামানো হয়েছে। এ অভিযোগ কেউ অস্বীকার করেননি। এসব সত্ত্বেও সকলেই আশা করছেন, এ রাজ্যে নির্বাচন হবে অবাধ, নিরপেক্ষ!

ফেডারেশনের দাপট বেশি স্বাস্থ্য দপ্তরে। এক লাখ কর্মচারীর ৮৫ শতাংশই নাকি ফেডারেশনের সমর্থক। এ জন্যই হোক কিংবা অন্য কোন কারণেই হোক, স্বাস্থ্য দপ্তরের কোন কর্মচারীকে নির্বাচনী কাজে ডাকা হয়নি। এক লাখ কর্মচারীর সকলেই ছুটিছাটা বাদ দিয়ে দশটা পাঁচটা কাজ করেন, ব্যতিক্রম শুধু এমার্জেন্সির সঙ্গে জড়িত হাজার পঞ্চাশেক। কর্মচারীদের অভাব পূরণ করা হচ্ছে পৌরসভা, পঞ্চায়েৎ আর স্কুল থেকে। অচ্ছুৎ শুধু স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মচারীরাই!

ভারত সরকারের জিওগ্রাফিকাল সার্ভের অন্তর্ভুক্ত প্যাটমোর (ঠিকানা ঃ ৫০/এ, গড়িয়াহাট রোড, কলকাতা-১৯) ডিরেকটর ডাঃ দাশ নির্বাচন ডিউটির জন্য যাঁদের নাম পাঠিয়েছেন তাঁদের সকলেই সিটু ইউনিয়নের সদস্য। তার সঙ্গে এমনকি টেকনিকাল স্টাফদেরও নাম আছে। ১৯৮০'র নির্বাচনে যাঁদের কপালে ইলেকশন ডিউটি জুটেছিল, তিনজন বাদে তাঁদের সকলেই বাদ। ডিরেকটরের কাছে, তাঁর নির্দেশ মত, যাঁরা নির্বাচনী ডিউটি চেয়েছিলেন, তার মধ্যে কপাল খুলেছে শুধু ১৬ জনের। প্যাটমো অফিসে ডিরেকটরের বিরুদ্ধে পোস্টার পড়েছে, শ্লোগানও উঠেছে।

সেচভবনের ইউ-ডি অ্যাসিসট্যান্ট সমীর দাসের নির্বাচনী ডিউটি পড়েছিল ডায়মন্ড হারবার লোকসভাকেন্দ্রের মথুরাপুরে। তাঁর অপরাধের সীমাপরিসীমা নেই। তিনি ইলেকসন রিটার্নিং অফিসারকে দরখাস্ত লিখে পোসটাল ব্যালট চান। বাড়ি দমদম সুভাষনগরে। ভোটের দিন বাইরে ডিউটিতে থাকলে পোসটাল ব্যালট চাওয়াই রীতি। ফরম পূরণ করে ২৪ পরগণার ই আর ও'র কাছে পাঠিয়েও দেন। নিয়ম অনুযায়ী ডাকে পোসটাল ব্যালটও আসেও, কিন্তু কার কেউ জানেন না। ছাপ মেরে কেউ পাঠিয়ে দিয়েছেন। পোস্টাল ব্যালট এমনি ডাকেই পাঠান হয়। রেজেস্ট্রি করে না।

এইভাবে অনেকের পোস্টাল ব্যালট বেহাত হয়েছে বলে জানা গেল। হুগলির চন্ডীতলা ব্লকের মৎস দপ্তরের ৫৮ জন কর্মচারীর নির্বাচন ডিউটি পড়েছিল হাওড়ায়। এঁদের ৫৫ জনের পোস্টাল ব্যালট বেহাত হয়ে গেছে। বারাসত স্বাস্থ্য দপ্তরেও একই কান্ড ঘটেছে।

বি জি প্রেস থেকে ব্যালট পেপার গেছে নির্বাচনী অফিসগুলোয় অর্থাৎ জেলাশাসক, মহকুমাশাসক এবং কলকাতার পাঁচটি ই. আর. ও অফিসে। এই অফিসগুলোতে সঠিক ব্যালটপেপার বেছে পঞ্চাশটি করে বান্ডিল বাঁধবার কথা। বহুক্ষেত্রে ৫০ এর বদলে অনেক বেশি। ৭৫ অবধি, ব্যালটপেপারের বান্ডিল বাধা হয়েছে বলে অভিযোগ এসেছে। এই বান্ডিলগুলো বি ডি ও ও পঞ্চায়েৎ অফিসে পাঠানোর কথা। পাঠানো হয়েছেও।

কিন্তু অশোকনগর বি ডি ও অফিসে একটি বান্ডিলে দেখা গেল ব্যালট পেপারের সংখ্যা ৫০ থেকে ১৩ টি কম।

যিনি হাতসাফাই করেছেন, পরে তিনি ধরা পড়েন। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিন্তু যাঁর বাড়িতে ব্যালট পেপার গেছে, তাঁর কাছে পুলিশ যায় নি। তিনি একজন লিডার যে! □

WITH ALL GOOD WISHES FROM

HINDUSTAN CABLES LIMITED
(A Govt. of India undertaking)

1. Pioneers in the manufacturer of widest range of Telecommunication Cables in India.
2. Meeting the needs of the Indian Posts and Telegraphs Department, Indian Railways, Defence Department and other Public and Private Sector Organisations.

Factories at

1) Rupnarainpur, Dist. Burdwan (West Bengal)

2) Moula Ali Industrial Estate, Hyderabad (A.P.)

TODAY MAN COMMUNICATES TO MAN THROUGH HCL.

নূপুরের মতো

অনুলিখন ঃ অনুপমা দাশ

হঠাৎ চমকে উঠলাম জাহাজের বেয়ারার ডাকে–'বাবু, ডিনারের ঘণ্টা বেজে গেছে।' ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি অনেকক্ষণ বসে আছি কোল্ড ড্রিঙ্কস নিয়ে আর ওই দু'জন ইংরেজও কখন চলে গেছে বার ছেড়ে। মনটা চলে গিয়েছিল ছোটবেলায়। ভাবতে ভাবতে ভুলেই গিয়েছিলাম ইংরেজ দু'জনের ওপর আমার রাগের কথা ও রাগের কারণ, তাদের সেই প্রশ্নের কথা।

এখন আর রাগ নেই। ইচ্ছে হোল ওদের খুঁজে নিয়ে ডেকে বলি, ইয়েস, আই অ্যাম এ ফার্স্ট ক্লাস প্যাসেঞ্জার অ্যান্ড আই নো দ্য রুলস হিয়ার।

খাবারের ঘরে গেলাম। রোজ যেমন পরিপূর্ণ থাকে ঘর, আজ যেন বড় ফাঁকা। বেয়ারা বললে, জাহাজের দোলানিতে অসুস্থ হয়ে পড়েছে অনেকেই, তাই তাঁরা আসেননি।

শুনে আমি তো অবাক। জাহাজ দুলছে ঠিকই এবং শুধু পাশাপাশি নয়, সামনে পিছনেও দুলছে সময় সময়। কিন্তু এতে অসুস্থ হবার কি আছে? যাই হোক, খাওয়া–দাওয়া হোল। এখানকার খাবার আমার খুব ভাল লাগে। দেশি–বিদেশি সুস্বাদু খাবার সবই আছে।

কেবিনে ফিরে এলাম। পোর্টহোল দিয়ে দেখি, জল বাড়ছে, আর ঢেউ এসে লাগছে জাহাজের গায়ে।

ক্রমে অসুস্থ লোকের সংখ্যা বাড়ল। আমার কেবিনেই দু'জন অসুস্থ, বমি করছেন অনবরত, কিছু খেতে পারছেন না। ডাক্তার ও জাহাজের লোকেরা তৎপর হয়ে উঠলেন প্রতিটি কেবিনেই। খাবার ঘরে লোকের সংখ্যা ক্রমশই কমছে। আশ্চর্য, আমার কিছুই হচ্ছে না, বমি তো নয়ই। জাহাজ এত জোর দুলতে শুরু করেছে যে না ধরে হাঁটা যায় না। ডেকের উপর চেয়ারে বসে থাকলে পড়তে পড়তে বেঁচে যাই –ভাগ্যিস চেয়ার টেবিল সব জাহাজের সঙ্গে আঁটা থাকে।

আজকাল এমন হয়েছে যে, চুপ করে বসে থাকলেই খালি চিন্তা হয়। আমার এই কুড়ি বছরের জীবনটাই ঘুরে ফিরে মনে আসে।

ঝড়ের কবলে চার পাঁচ দিন হলো আমরা পড়েছি। যাত্রীদের মধ্যে আমিই একমাত্র লোক যে উঠে চলে বেড়াতে পারছি। আমি অন্য সবাইয়ের মত অসুস্থ নই, অথচ চারিদিকে অসুস্থ লোকের ছড়াছড়ি—সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

এসময় ভাইদের বড় কাছে পেতে ইচ্ছে করত। মনে হত ওরাও যদি এ জাহাজে থাকত। এই ঝড়, এই দুলুনি—ওরাও কি আমার মত সইতে পারত, নাকি অসুস্থ হয়ে পড়ত। ডেকের উপরই চেয়ারে বসে বসে ভাবছিলাম, রাজু, দেবু, ভূপেন আর ছোট্ট যে ভাইটি জন্মেছে তার কথা।

আহা, ভূপেনটা বড় সরল ও খালি নিজের খেয়ালে বকবক করতে ভালবাসত। তাই নিয়ে সবাই ওকে ঠাট্টাও করত। কেন জানিনা, আমি চুপ করে ওর গল্প বা বকবক্ শুনতাম—বেশ লাগত। ওর আজগুবি কল্পনার কোন সীমা পরিসীমা ছিল না। হঠাৎ কোথা থেকে এসে গল্প বলতে শুরু করতো—'দাদা! একটা বিরাট সাপ! ঘাসের মধ্যে ব্যাঙ লাফাচ্ছে। মোটা–মোটা গোল–গোল ব্যাঙ, গোল চোখ। খালি লাফাচ্ছে তারা, ডাকছে, খালি ডাকছে। সাপটা এগিয়ে আসছে আস্তে–আস্তে, টপ করে খেয়ে নিল একটা ব্যাঙ। তারপর গিলছে, গিলছে—এমন সময় একটা চিল তাকে দেখল—চিলটা নিচে নামছে–নামছে.....।' এমনি করে একটানা বলে যাবে। বেশ বুঝতে পারতাম আমাকে ও সবচেয়ে ভালবাসে। আমার খাতা, পেন্সিল জিনিসপত্র ওর বড় প্রিয়—আমার নিজের একটা টেবিল ছিল, সেটা ওর সবচেয়ে আকর্ষণীয় বস্তু। যখন–তখন টেবিল থেকে জিনিস নিয়ে খেলবে। একদিন আমি খুব বকেছি। বলেছি, কখনও আমার টেবিল থেকে জিনিস নেবে না। তারপর দিন দেখিও আমার টেবিলের উপর হাত রেখে তার উপর থুতনি দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে আমার দিকে তাকিয়ে। আমি তখন আঁকছিলাম, বললাম, কিরে? ও কিছু জবাব না দিয়ে অমনি ভাবেই দাঁড়িয়ে রইল।

হঠাৎ দেখি, হাতের কনুই দিয়ে একটা পেন্সিল ও ঠেলছে। আমি প্রথমে অত নজর দিইনি, শুধু মুখে বললাম, কি করছিস? হঠাৎ ঠক্ করে একটা শব্দ হলো, আর ভূপেন দেখি নিচু হয়ে মাটি থেকে কি একটা কুড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে।

চেঁচিয়ে উঠলাম, কি হলো ভূপেন? আমার ডাকে ও দাঁড়িয়ে পড়লো। দেখলাম, ওর হাতে মুঠো করে ধরা সেই পেন্সিলটা, যেটা একটু আগে ও ঠেলছিল কনুই দিয়ে।

আমি অসন্তুষ্ট হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তুই আবার টেবিল থেকে জিনিস নিলি? বারণ করেছি না একবার? ভূপেন বড়–বড় চোখ ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'তুমি ত টেবিল থেকে নিতে বারণ করেছ, আমি ত মাটি থেকে নিলাম।'

ওর কথা ভেবে মনটা বড় খচখচ করতে লাগল। সত্যিই ও আমাকে বড় ভালবাসে।

দেবুটাও কি কম ছেলেমানুষ নাকি? ঝালাওয়াড়ে আমাদের বাড়িতে দরজায় সর্বদাই সান্ত্রিরা পাহারা দিত। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে বাবার বিশেষ মর্যাদা ছিল ওখানে। স্বভাবতই আমাদের যাওয়া–আসার সময় সান্ত্রি বন্দুক কাঁধে নিয়ে সিপাহি–কায়দায় সেলাম করত। দেবু সে–সময় খুব ছোট, কাজেই ওকে দেখলে সান্ত্রিরা কোলে নিয়ে আদর করতো। এসব কিন্তু ছোট্ট দেবুর মোটেই পছন্দ ছিল না।

একদিন তাই সান্ত্রিদের কাছে গিয়ে বললে, 'দাড়াও?' 'কাধে বন্দুক নাও'..... 'পায়ে আওয়াজ কর খট্–খট' 'কপালে ডান হাত ঠেকাও।'

সান্ত্রিরাও সন্ত্রস্ত হয়ে ছোট দেবুর হুকুম তালিম করতে লাগল। দেখে দেবুও খুশি, দরজা পেরিয়ে এপারে এসে সান্ত্রিদের বললে, 'ঠিক হ্যায়, রোজ অ্যায়সা করনা।'

সান্ত্রিরা পরে আমাকে বলেছিল–দেবুর কীর্তির কথা।

ভাইদের মধ্যে রাজু বরাবরই একটু গম্ভীর, বড় ইন্টেলেকচুয়াল ভাব। কম কথা বলে, পড়াশুনায় খুব মন—পৃথিবীর কারেন্ট খবর সব ওর জানা। সে–সব নিয়ে আলোচনা করতেও রাজু খুব ভালবাসে।

এসব ভাবতে–ভাবতে আমার খুব হাসি পেল। বেশ জোরেই হেসে উঠেছিলাম। ঐ রকম বেকায়দা অবস্থা তখন, জাহাজের চারিদিকেই অসুস্থতার ছাপ। তার মধ্যেও আমার হাসি পেয়েছিল নিজেরই ছোটবেলার কথা মনে করে।

আমি নিজেও কি কম ছেলেমানুষি করেছি নাকি?

বরাবর আমার মোটর—সাইকেলের বড় শখ—কি সুন্দর আওয়াজ ভট্–ভট–ভট্–ভট! কিন্তু এত ছোট ছেলেকে কে কিনে দেবে মোটর সাইকেল? ইচ্ছে করতো মোটর সাইকেল চড়ে ইস্কুলে যাব, বেড়াতে যাব। তখন গাজীপুরের ভিক্টোরিয়া হাইস্কুলে পড়ি। স্কুলে যাবার পথে রাস্তার মোড়ে কোথায় একটা বিরাট বটগাছ ছিল। সকলের বিশ্বাস ছিল ঐ গাছটিতে কোন অতি–শক্তির বাস এবং তাকে খুব সহজেই সন্তুষ্ট করা যায় ও মানত করলে ফলও পাওয়া যায়। কি এক বিশ্বাসের ফলে লোকেরা রাস্তা থেকে নুড়ি, কাঁকর নিয়ে গাছটির গোড়ায় দিত। কবে থেকে এরীতি

চলে আসছে জানিনা। কেননা গাছটির কান্ডটি একেবারে ঢেকে গেছে কাঁকরে-কাঁকরে—গাছটির নামও কঙ্করদেব।

আমিও রোজ স্কুলে যাবার সময়ে একমুঠো কাঁকর নিয়ে আমার মোটর-সাইকেলের প্রার্থনা জানিয়ে গাছের গোড়ায় দিয়ে যেতাম।

একদিন মোটর-বাইকের কথা ভাবতে ভাবতে স্কুলে যাচ্ছি—হঠাৎ কেমন যেন লাগলো। চোখের সামনে দেখলাম আলো..... অতি উজ্জ্বল আলো, আর তার মধ্যে এক দেবীমূর্তি দাঁড়িয়ে। তাঁর পরণে সাদা কাপড়। গা থেকে জ্যোতি বেরুচ্ছে। আর তাঁর পাশেই রাখা একটি মোটর-বাইক; দেবী ধীরে ধীরে আমার কাছে এগিয়ে এলেন। বললেন, 'এই নাও বাছা! এটা তোমার, তুমি চড়ো এতে।'

আর আমিও যেন দু'হাতে ওটাকে ধরে আস্তে আস্তে আমার পা ওর উপর তুলতে লাগলাম। হঠাৎ পাশে পায়ের শব্দ ও হাসির শব্দে তাকিয়ে দেখি—রাস্তায় লোকেরা দাঁড়িয়ে পড়েছে। আর আমার চারিদিকে কোথায় বা সেই দেবী, কোথায় বা মোটর-সাইকেল!

মোটর-বাইক আমার হয়নি বটে কিন্তু ঝালাওয়ারে গিয়ে আমার নিজের একটা সাইকেল হয়েছিল, আর তারই স্পোকের কাছে একটা কাঠি আটকে দিয়েছিলাম। কট্-কট্ কট্-কট্ করে আওয়াজ ত হোত—নাইবা হোল ভট্-ভট্-ভট্-ভট্ আওয়াজ!

এসব কথা ভাবতে ভাবতে উঠে পড়লাম চেয়ার থেকে। ডেকে তখন কোন লোকই নেই। কর্মচারিরাও যারা ঘুরে বেড়াচ্ছে তারাও কেউ আর সম্পূর্ণ সুস্থ নয়—বমি করেছে, আর টলে-টলে হাঁটছে।

কেবিনে যাওয়া মুসকিল হয়ে পড়লো তারপর থেকে।—চারিদিকে বমি, পায়খানা, সে যা দুর্গন্ধ! প্রথম দিকে জমাদার পরিস্কার করত। কিন্তু পরে তারাও অসুখে পড়লো। তখন কে কাকে দেখে? পাহাড়ের মত বিশাল ঢেউ এসে

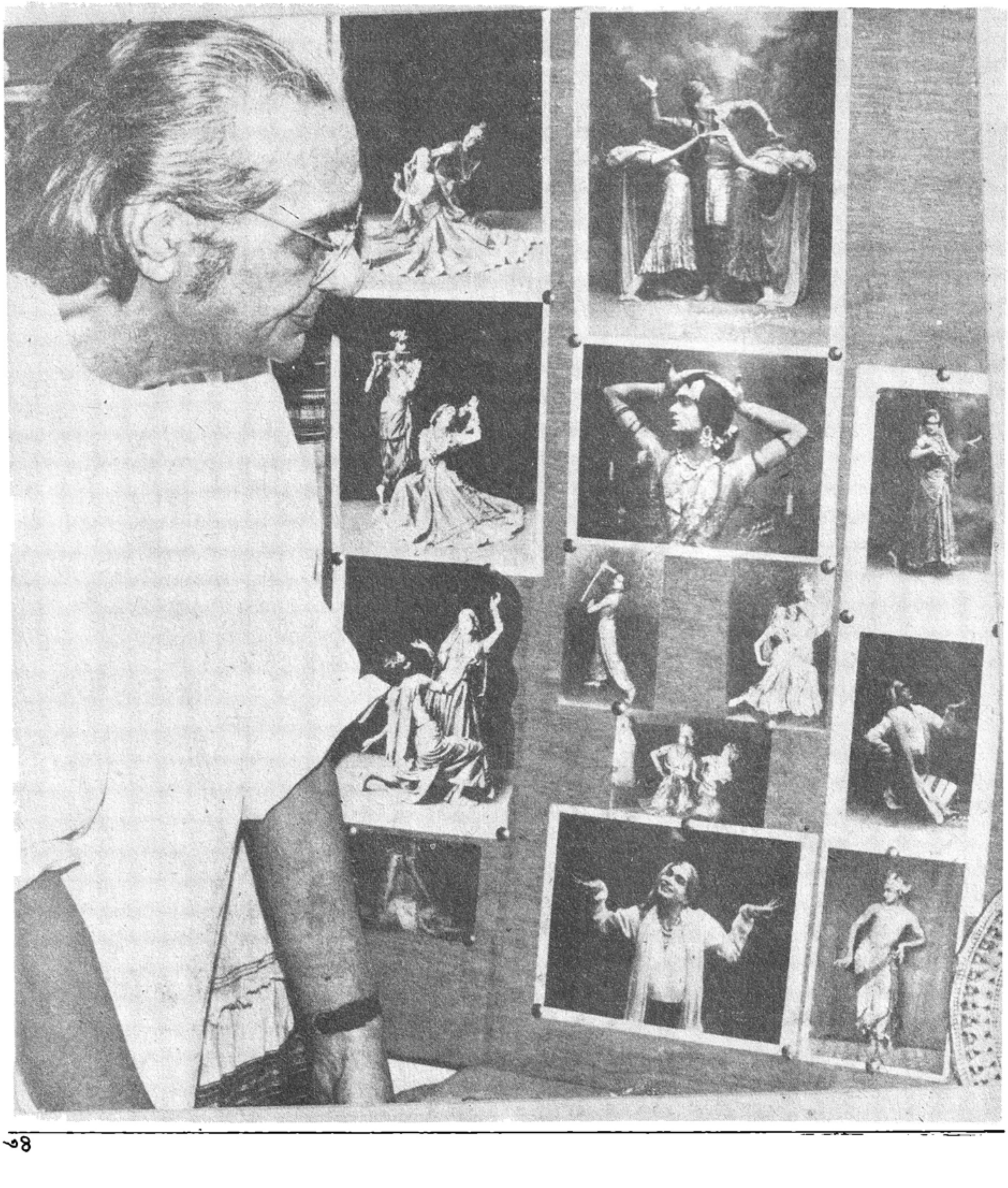

আঘাত করছে জাহাজের গায়ে ত্রিপলের উপর! কী আওয়াজ আর ধাক্কা। মনে হচ্ছে কামান যেন গর্জে উঠেছে—আশঙ্কা হয় জাহাজটা ফেটে যাবে নাতো?

কেবিনে যাওয়া ছেড়ে দিলাম। লাইব্রেরি ঘরে টেবিলের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে থাকতাম দুই হাতে টেবিল আঁকড়ে ধরে! যে কোন মুহূর্তে পড়ে যেতে পারি। দিনের পর দিন এভাবে আর ভাল লাগছিল না।—একটা লোকের মুখ দেখতে পাই না। সবাই বিছানায় অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে, আর আমার কিছু হয়না। বমি না হলেও ঐ প্রচন্ড দোলানি ও আওয়াজে মাথাটা ঝিম্-ঝিম করত—বই পড়ব, তাও সম্ভব হত না। অগত্যা খালি চিন্তা আর চিন্তা! কত কি চিন্তা-ভাবনা!

এই অকূল সমুদ্রে সামনে পিছনে কোথাও কোন ভরসা নেই। কূলের চিহ্নমাত্র নেই। সামনের কূল সম্পূর্ণ অচেনা অজানা। কিন্তু যেকূল পিছনে ফেলে এলাম সেতো তার সব ঘটনা নিয়ে স্মৃতিপটে জ্বলজ্বল্ করছে।

সদ্য ফেলে আসা বোম্বাই শহর! বন্ধু-বান্ধবে ভরা ঝক্‌মকে বোম্বাই। অতবড় শহর তখন পর্যন্ত আমি দেখিনি।

ঝালাওয়াড় থেকে বাবা আমাকে বোম্বাই পাঠান জে. জে. স্কুল অব আর্ট-এর ছাত্র হিসাবে ভর্তি হবার জন্য। মতিলাল ওয়াড়িলাল শা এক হস্টেল খোলেন বোম্বাইতে জৈন ছেলেদের জন্য। সব বিষয়ের ছাত্ররাই থাকতে পারে সেখানে। ওখানে ভর্তির কথায় মা প্রথমটা আপত্তি করেন। কারণ ওরা নিরামিষ খায়, এমনকি মাটির তলায় উৎপন্ন ফসলও খাবে না। মার চিন্তা—আমি থাকবো কি করে? বাঙালীর ছেলে ভাত-মাছ খেয়ে মানুষ। তায় আবার জৈন নয়। কী হবে?

বাবার কাছে শুনেছিলাম—আমাদের মহারাজা হস্টেলের ফান্ডে তখনকার দিনেই এগারো হাজার টাকা দান করেন। কাজেই স্পেশাল কেস হিসাবে, স্পেশাল পারমিশানে ওখানে আমি ভর্তি হতে পারি।

মনে আছে—এলিমেন্টারি ক্লাসে প্রথমে ভর্তি হই। পরীক্ষার সময় আমাদের একটা মেমারি ড্রয়িং করতে হয়েছিল সামনে ও পাশে দুই দৃষ্টিকোণ থেকে।

আমি এঁকেছিলাম একটা পায়রা মুখে কাঠি নিয়ে উড়ছে। দুই ভাবেই এঁকেছিলাম। পরীক্ষা হলে যখন আঁকছি, তখন যাঁরা গার্ড দিচ্ছিলেন তাঁরা বারবার আমার কাছে দাঁড়িয়ে আঁকা দেখছিলেন, আর নিজেদের মধ্যে কিসব বলাবলি করছিলেন। সে-সময় আমার ত' ভীষণ নার্ভাস বোধ হচ্ছিল—কী এমন দোষ করেছি যার জন্য তাঁরা আমার আঁকা দেখে যাচ্ছেন। সাহসে ভর করে তাঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি অবাক হলাম। সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাঁরা আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁদের অমনি দৃষ্টি দেখে আমি উৎসাহ ও ভরসা দুই-ই পেলাম তখন। আমার আঁকায় তাঁরা বা পরীক্ষকরা এত খুশি হয়েছিলেন যে ইন্টারমিডিয়েট ও ফার্স্ট ইয়ার এই দুই ক্লাস ডিঙিয়ে একেবারে সেকেন্ড ইয়ারে প্রমোশন দেন। আর থার্ড ইয়ারে থাকাকালীন বাবার 'তার' পেয়ে আমি চলেছি বিলেতে। জে. জে. স্কুল অব আর্টের ছাত্র শিক্ষক সকলেই আমাকে খুব ভালবাসতেন। বম্বেতে এসে প্রথম অন্তরঙ্গতা হয় মতিলাল ওয়াড়িলাল শাহর ছেলে শান্তিলালের সঙ্গে। খুব ভাল ছেলে।

ও আমাকে বোম্বাই-এর ইরানি হোটেলের খবর দেয়। মার মত ওরও দুশ্চিন্তা হয়েছিল—'উদয় বাঙালী ছেলে, এখানে ওর খাওয়ার কষ্ট হবে।'

ভাল ছাত্র হিসাবে বিদ্যালয় থেকে স্কলারশিপ পেতাম। কাজেই আমার রঙ, তুলি, কাগজের যাবতীয় খরচ চলে যেত ঐ স্কলারশিপের টাকায়। বাবা কিন্তু মাসে মাসে ষাট টাকা মাসোহারা পাঠাতেন। তার এক পয়সাও খরচ করতে হোত না—আমার নিজের আঁকার জন্য। সে-টাকায় অনেক ছেলেদের প্রয়োজনীয় আঁকার সরঞ্জাম কিনে দিয়েছি, আর সকলকে নিয়ে খেয়েছি ঐ ইরানি হোটেলে।

সেকেন্ড ইয়ারে থাকার সময় আমার আর এক অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল হুসেন। শুধু বন্ধু নয়, প্রতিদ্বন্দ্বীও বটে। অনেক সময় শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার বা কৃতিত্ব আমাদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যেত। হুসেন বর্তমান ভারতের বিশিষ্ট চিত্রশিল্পীদের অন্যতম।

হস্টেলে আমি যে ঘরে থাকতাম, সেখানে আরও তিনজন ছেলে থাকত। তারা পড়ত ডাক্তারি।

তারা কঙ্কাল নিয়ে, হাড়গোড় নিয়ে নাড়াচাড়া করত। আমার বরাবর ইন্টারেস্ট এব্যাপারে। ওদের সঙ্গে আমিও যোগ দিতাম। ওরাও আমাকে খুব ভাল বাসত। অনেক সময় ওদের কলেজেও গিয়েছি। ডিসেকশনরুমে প্রথম প্রথম বড় বিশ্রী লাগত। কিন্তু অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। কোন বড় সমাবেশে ওদের প্রফেসর লেকচার দিলে সর্বদা আমাকে নিয়ে যেত—আর বাড়ি ফিরে এসে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতাম—ওরা আমাকে বুঝিয়ে দিত।

সন্ধ্যাবেলা প্রায়ই চলে আসতাম হস্টেলের ছাদে। প্রিন্সেস ষ্ট্রিটের পাঁচতলা বাড়ির উপরের তলায় আমাদের হস্টেল। সারা বাড়িতেই শিল্পপতি ওয়াড়িলাল শাহর অফিসে ভর্তি।

ছাত থেকে কতদিন দেখেছি, বন্দরে জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে, জাহাজের ভোঁ শুনেছি। আর আজ কিনা আমি সত্যি-সত্যি তেমনি এক জাহাজের ভিতর এমনি এক পরিবেশে ভয়াবহ অবস্থায় চলেছি কোথায়! যাই হোক, ছাদে দাঁড়ালে আরেকটি জিনিস চোখে পড়ত। তা হোল অন্য কোন ছাতে গরবা নৃত্য। বেশ নাচ। শুধুই মেয়েরা নাচে। রাসলীলার নাচ। আর গাজীপুরের এক রকম নাচ আছে, সেও রাসলীলা। তবে সে শুধু পুরুষদের নাচ। নাম-নাওটাংকী।

একদিন সকালে বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে-বেড়াতে গ্রান্ট রোডের ধারে দেখি এক জাপানি বুড়োর উল্কির দোকান। নানান দেব-দেবীর মূর্ত্তি ও নাম সে পরিয়ে দেয় বৈদ্যুতিক সূচ দিয়ে নানান রঙ-এর বাহারে।

আমরা সবাই গেলাম। বেছে-বেছে বিষ্ণুর লাল আভাযুক্ত ছবি নিলাম। আমার ডান হাতে বুড়োটি পরিয়ে দিল বিষ্ণুর উল্কি। উঃ, সেদিন হাতে যা ব্যথা হয়েছিল, পরে হাত ফুলে যায়। জ্বরও হয়েছিল বেশ। ডান হাতে ঐ বিষ্ণুর ছবি, আর বাঁ হাতে ইউ এস. সি. লেখা। ওটা লিখিয়েছিলাম নসরতপুরে আরও ছোটবেলায় এক জিপ্‌সি মেয়ের কাছে। কি এক মেলা উপলক্ষ্যে জিপসিরা এসেছিল সেখানে।

বন্ধু শান্তি থাকতো কাছেই, বোম্বাই থেকে কয়েকটা স্টেশন পরেই ঘাটকোপর নামে এক শহরতলি জায়গায়। প্রায়ই যেতাম ওদের বাড়ি। ওর মা আমাকে খুব স্নেহ করতেন। ঘাটকোপরের কথা মনে হলেই আমার বিস্ময় ও কৌতূহল যেন দিশেহারা হয়ে যায়। সেই জ্যোতিষীর গণনার মত এও এক পরম আশ্চর্য ঘটনা আমার জীবনে।

একদিন শান্তির বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করে ফিরছি বোম্বাই। শান্তির বাড়ির লোকেরা ও মা সবাই বারণ করেছিলেন অত রাতে ফিরতে। আমি শুনিনি তাঁদের কথা। ওঁদের সব দুশ্চিন্তাকে একরকম হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলাম। শেষে তাঁরা বলেছিলেন একটা লন্ঠন নিয়ে যেতে। আমি তাতেও রাজি হইনি। বেশ একটু শো-অফ করেই ঐ রাত্রের অন্ধকারে আমি বেরিয়ে পড়ি। স্টেশনে আসতে হলে একটা মাঠ পেরোতে হয়। চলেছি মাঠের মধ্যে দিয়ে। চারদিকে অন্ধকার। হঠাৎ কেন যেন দাঁড়িয়ে পড়লাম। পা যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল! ভীষণ ভয় করতে লাগল! আর এক পাও এগুতে পারছি না। নিজের অজান্তে শান্তির বাড়ির দিকে ছুটে চলেছি।

হাঁপাতে-হাঁপাতে ওদের বাড়ি পৌঁছে বললাম, শিগগির একটা আলো দাও। অনেকেই ঠাট্টা করছে শুনতে পেলাম। কোন দিকে কান না দিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লাম। মাঠের ঐ জায়গায় এসে আবার থেমে পড়লাম—লন্ঠনের আলোয় পরিষ্কার

দেখতে পেলাম একটি বিরাট গোখ্‌রো সাপ পড়ে রয়েছে। তারপর সেটি ধীরে-ধীরে সর্‌-সর্‌ করে এক পাশে চলে যাচ্ছে। ভয়ে আবার দৌড়। মনে হতে লাগল সারা মাঠটাই যেন সাপে ভরা। আর আমি তাদের মধ্য দিয়ে পা বাঁচিয়ে ছুটেছি। বড়-বড় পা ফেলে দৌড়তে-দৌড়তে আবার শান্তির বাড়ি গেলাম। আমার চোখ-মুখের অবস্থা দেখে সবাই বারবার প্রশ্ন করলে, কী হয়েছে? কিন্তু আমার তখন উত্তর দেবার সামর্থ নেই। ভয়ে বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেছি যেন। শান্তিকে বললাম, আমি আজ আর যাব না, এইখানেই শোব।

অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। শান্তিদের বাড়িতে বিছানায় নিরাপদে নিশ্চিন্তে শুয়েও কিন্তু আমি ঘুমোতে পারিনি। পুরো ঘটনাটা মনের মধ্যে উঁকি দিল।

বেশ ত' হেঁটে যাচ্ছিলাম। আমি ত নিজে থামিনি। আমি ত' জানতাম না ওখানে সাপ আছে।-কেউ যেন জোর করে থামিয়ে দিয়েছিল। কে? কে? আমি যদি না থামতাম, আর এক পা এগুলেই পা পড়তো গিয়ে সাপের গায়ে। সঙ্গে-সঙ্গেই ক্রুদ্ধ সাপ দংশন করতো আমাকে। কী আশ্চর্যজনকভাবে প্রাণে বেঁচে গেলাম আমি। কে আমাকে বাঁচালে, আমার প্রাণ রক্ষা করলে? নিশ্চয়ই ভগবান! কিন্তু তিনি কি নিজে এসে এমনিভাবে রক্ষা করেন? কেননা আমার কাছাকাছি কোন লোকই ছিল না। ধূ-ধূ মাঠ, নিশ্ছিদ্র অন্ধকার! আমার চোখ জলে ভরে এলো। মনের মধ্যে বিস্ময়ের, আনন্দের, ভক্তির এক মিশ্র অনুভূতির অনির্বচনীয় অভিজ্ঞতা লাভ করলাম। সে-দিনটা স্মরণীয় হয়ে রইল আমার কাছে।"

নিজের ছেলেবেলার ঘটনা বলতে বলতে হঠাৎই চুপ করে গেলেন দাদা। তাঁর মুখের ভাব দেখে আমিও আর কিছু জিজ্ঞাসা করলাম না। কি যেন ভাবছেন তিনি।

তারপর হঠাৎ নিজেই আবার কথা বললেন দাদা। "আজ এই উনিশশ' তিয়াত্তর সালে, নিজের তিয়াত্তর বছর বয়সে তোকে এই গল্পটা বলতে গিয়ে আবার আমি পেলাম সেদিনের সেই অনির্বচনীয় অনুভূতির স্বাদ। শুধু তোকেই নয়, অনুপমা, এ গল্প আমি বহুজনের কাছে বহুবার করেছি, আর জিজ্ঞাসা করেছি, কে সেদিন আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিল, আমায় থামিয়েছিল? অবচেতন মন? সহজাত প্রবৃত্তি বা ইনস্‌টিংক্‌ট? অথবা যোগাযোগ? কিন্তু যাই বল না কেন, কোন উত্তরই আমার মনঃপূত নয়। ঐ অন্ধকারে না-জানা বিপদ থেকে আমায় যিনি রক্ষা করলেন, তিনি নিজেও ছিলেন অদৃশ্য। চোখের দেখা, কানের শোনা, এই সব যুক্তি দিয়েই আমরা সব কিছুই বিচার করতে চেষ্টা করি। কিন্তু সেই বিচার যে

শেষ কথা নয়, আমার জীবনই তো তার প্রমান।

যাক্‌, বোম্বাই-এর ছাত্রাবস্থার দিনগুলির কথা বলছিলাম। সেখানে থাকার সময় প্রতি ছুটিতে যেতাম বাড়িতে মায়ের কাছে। কখনও ঝালাওয়াড়ে, কখনও বা কাশীতে।

বাবা ঝালাওয়াড়ে যে বাড়িটাতে থাকতেন, সেটাই একটা বিরাট প্রাসাদের মত। বম্বে যাবার আগে আমি বাবার সঙ্গে একা ঝালাওয়াড়ে ছিলাম। ঐ সময় বাবার সংগে বেশ একটা বোঝাপড়া হয়। এর আগে বাবাকে মনে হোত বাইরের লোক। সেই প্রথম আমি অনুভব করি বাবার স্নেহ। আমার তখন সতেরো বছর বয়স। আর বাবার উনচল্লিশ বছর। অপূর্ব চেহারা তাঁর। তার উপর যখন চোগা-চাপকান পরে মাথায় পাগড়ি বেঁধে কাজে যেতেন, তখন কি সুন্দর দেখাত তাঁকে!

বাবা বেরোনোর আগে বাড়িতে যেন ঝড় বইত। চাপরাশির পর চাপরাশি আসতো চিঠি নিয়ে, ফাইল নিয়ে। সঙ্গে আসতো কেরানি। তিনি এগিয়ে দিতেন এটা-ওটা। কখনও বা পড়েও দিতেন কিছু। বাবা দাড়ি কামাতে-কামাতে, কিংবা পাগড়ি পরতে-পরতে শুনতেন, বা সই করে দিতেন। সে কী ব্যস্ততা! তারপর সব রেডি হয়ে গেলে উনি গাড়িতে উঠতেন ফাইল ও কেরানি সমেত। তখন বাড়িটা যেন হঠাৎ চুপ হয়ে যেত। বিরাট একটা ঝড় বয়ে গেল যেন! তারপর সব ঠান্ডা। রোজ এই হোত।

আমি নিজের খুশিমত কখনও ছবি আঁকতাম, নয়ত জিপ্‌সী ও টিবুর সঙ্গে খেলা করতাম। টিবুকে পেয়েছিলাম মহারাজার কাছ থেকে।

রাজকুমার রাজেন্দ্র সিং আমার সমবয়সী ছিল। ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল। আমরা একসঙ্গে টেনিস খেলতাম রাজবাড়ির লনে।

আমার ছোটবেলা থেকেই জন্তু-জানোয়ারের শখ ছিল। তাই বাড়িতেই একটি ছোটখাট চিড়িয়াখানা গড়েছিলাম।

একদিন আমার হাতে ছোট্ট টিবুকে তুলে দিয়ে রাজেন্দ্র সিং বললে, 'বাবাকে একজন এই বাঘের বাচ্চাটি উপহার পাঠিয়েছেন। তোমার ত' চিড়িয়াখানা আছে, একে রাখবে? আমি ত ভীষণ খুশি হয়ে তখনই কোলে করে নিয়ে এলাম ওকে বাড়িতে। তারপর থেকে নিজে হাতে দুধ খাইয়ে, আদর-যত্ন করে ওকে বড় করে তুলতে লাগলাম।—কে বলবে বাঘ? ঠিক একটা বেড়ালের মত আদুরে এবং নিরীহ। প্রথম-প্রথম জিপ্‌সি একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল। পরে ওরও ভাব হয়ে গেল টিবুর সঙ্গে। কুকুর আর বাঘ এক সঙ্গে খেলা করত। টিবুর স্পেশাল খাঁচার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমি বাড়িতে না থাকলে ও ঐ খাঁচায় থাকতো। টিবু বড় হবার পরও আমি ওর সঙ্গে খেলা করেছি, ওকে সংগে নিয়ে বেড়িয়েছি। বোম্বে থেকে ছুটিতে বাড়ি আসলে ও কি করে যে টের পেয়ে যেত ভাবতে পারি না। বাড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই শুনতে পেতাম ওর ডাক। আদুরে গলায় ডাক দিত। ও যেন কত খুশি হয়েছে আমার গন্ধ পেয়ে। আমাকে দেখে তারপর আরম্ভ করতো মাতামাতি! লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে, দাপাদাপি লাগিয়ে দিত! আমিও এক ছুটে খাঁচার দরজা খুলে সোজা ভিতরে চলে যেতাম। উঃ, সে কি আদর আমাকে।

মা অবশ্য খুব রাগ করতেন। বলতেন, 'খোকা, এত বাড়াবাড়ি ভাল না।' শেষ পর্যন্ত আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন যে, কখনও খাঁচার মধ্যে ঢুকবো না। কিন্তু ওর কাছে গেলে ওর কাকুতি-মিনতি দেখলে না গিয়ে পারতাম না। সে-সময়ে ও সাত-সাড়ে সাত ফিট লম্বা হয়েছে।

ধারাবাহিক

রানাঘাটঃ সমাজবিরোধীদের মুক্তাঞ্চল

বিমান মুখোপাধ্যায়

"রানাঘাট মহকুমায় ব্যাপক এলাকা জুড়ে পর পর খুন আর খুন সাধারণ মানুষকে আতঙ্কিত সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। শহর বিভীষিকাময়। সন্ধের পর শহরবাসী বাড়িতে বন্দী। জেলা পুলিশ দপ্তরের তাবড় তাবড় নেতারা ছুটে এসেও তাল রাখতে পারছেন না। জেলা শাসক পুলিশ সুপারের দৌড়দৌড়ি সার। মহকুমা অফিসার এবং এস. ডি. পিও ঘুমনোর সময় পাচ্ছেন না। আবার নতুন করে পুলিশ প্রশাসনের মেরুদন্ডে হিম প্রবাহ বইয়ে দিয়েছে খুনে ও লুঠেরাদের হানাহানি।"

'রাতু' রানাঘাটের সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ৯.১১.৮৪। স্থানীয় পত্রিকায় এই রিপোর্টের পর ১৬.১১.৮৪ পর্যন্ত অর্থাৎ শুধু পরের সাতদিনেই খুনের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০। পুলিশী হিসাবে এর সংখ্যা ৪। সন্ধ্যের সঙেগ সঙেগ রানাঘাটে এগিয়ে আসে এক থমথমে ভাব। রাত আটটার শহরকে দেখলে মনে হবে মাঝরাত। কোন মানুষই রাস্তাঘাটে একা নিরাপদ নন। খুন খারাপির বলি হচ্ছেন সম্পূর্ণ নিরীহ মানুষও। অপরাধীদের নামধাম বলা দুরের কথা, সামান্যতম আলোচনাও বাসিন্দারা এড়িয়ে যেতে চাইছেন। অবাধ খুন জখম–লুঠ–ওয়াগন ভাঙা–প্রকাশ্যে চোলাই মদের ব্যবসা, তার সঙেগ বাংলাদেশ থেকে স্মাগলিং হয়ে বেরিয়ে আসা নামী দামী জিনিসের ফলাও কারবার। প্রশাসনের এক মুখপত্র স্বীকারই করলেন, 'হ্যাঁ রানাঘাটের অপরাধ জগতে প্রচুর টাকা খাটছে। মাসে ২০ থেকে ৩০ লক্ষ টাকা হবে।'

গত নভেম্বর মাসের এক ঘটনার কথা এক প্রত্যক্ষদর্শী জানালেন, রাত নটা নাগাদ মহাপ্রভু পাড়ার সামনে তিনটে লোক ছোটব্রীজের রেলিংগুলো খুলে ফেলছিল। খানিক তফাতেই ছিল রেলের তিনচারজন পুলিশ। অগত্যা পথ বদলে অন্য রাস্তা দিয়ে তিনি বাড়ি ফেরেন। 'এগুলো দেখা বা সামনাসামনি পড়ে যাওয়াও খুব বিপজ্জনক।' তিনি জানালেন, রানাঘাটের সবচেয়ে সন্ত্রস্ত এলাকা—সূর্যনগর, উত্তর নাসরা, কুমুথনগর, কীর্তিনগর, চূনুরীপাড়া, বন্দিরগাছি, দক্ষিণ পাড়া, রামনগর, আঁইশতলা, বাগচীপাড়া, আনুলিয়া, পায়রাডাঙা। এবং দ্বারিকানগর থেকে মহাপ্রভু পাড়ার কিছু অংশ ক্রমশ পূর্বাঞ্চল থেকে রেললাইনের এপারে, পশ্চিমদিকেও সন্ত্রাস ছড়িয়েছে। 'ব্যবসার অবস্থা খুব খারাপ।' বললেন সুভাষ এভেনিউয়ের এক দোকনদার। প্রতি মুহূর্তেই আতঙ্ক। আছে 'তোলা' আদায়ের জুলুম। 'তাও সেখানে তিন চারটে গ্রুপ। কি পুলিশ, কি রাজনীতির লোকজন দুপক্ষই এ ব্যাপারে নীরব। এই অবস্থা রানাঘাটে আর কত দিন চলবে?' এ প্রশ্ন আজ অনেকেরই। প্রায়ই লক্ষ্য করেছি কথা বলার সময় কেউ এসে পড়লে হঠাৎ চুপ করে যেতে। সন্দেহজনক ব্যক্তি কিনা জিজ্ঞাসা করাতে প্রায় ক্ষেত্রেই এক কথা 'সেরকম কিছু না হলেও সাবধান থাকা ভাল।'

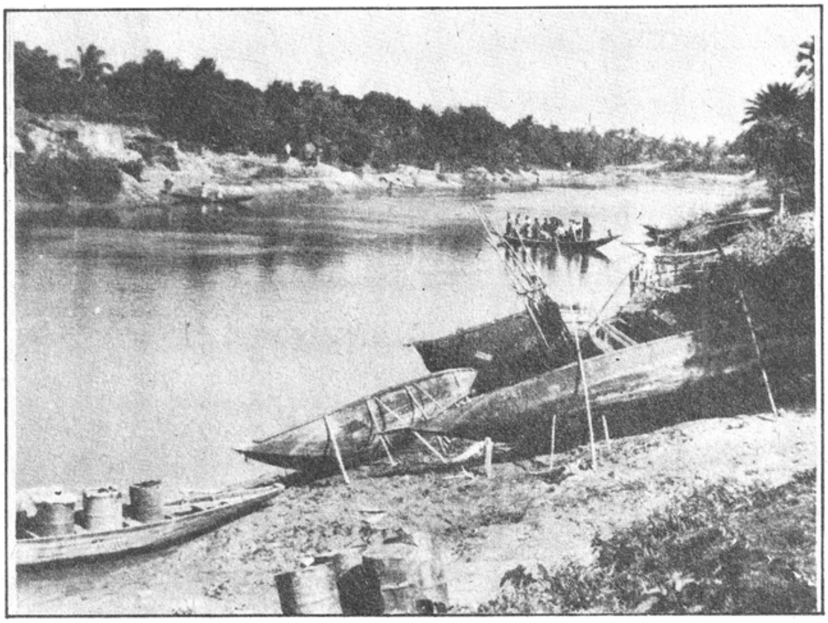

আড্ডার চরিত্রও বদলেছে। এপাড়া ওপাড়া আতঙ্ক। বেশিরভাগ ইয়ং ছেলেই সন্ধের পর বাড়িতে বন্দী। কয়েকটা বাড়িতে জমে উঠছে আড্ডার আসর। বদল হচ্ছে নির্দোষ আড্ডার রঙও। ক্রমশ: দেখা দিচ্ছে মদ, তাসের জুয়াও। এমনকি গত দুর্গাপুজোর সময়েও এর হেরফের হয়নি। রাত নটা সাড়েনটার মধ্যে রাস্তাঘাট ফাঁকা। ঘুম থেকে উঠে এখন প্রায়ই শোনা যাচ্ছে অমুক জায়গায় কার একটা ডেডবডি পড়ে আছে। ৫ নভেম্বর কালীনারায়ণপুর ব্রীজের নিচে পাওয়া গিয়েছিল গলাকাটা এক যুবকের দেহ। ৭ নভেম্বর ভোরবেলায় ঠিক একইভাবে দেখা গিয়েছিল আরেকটা দেহ প্রাক্তন বিধায়কের বাড়ির সামনে। অনুমান গলায় ফাঁস লাগিয়ে যুবকটিকে খুন করা হয়েছে। তিনি কাজ করতেন রানাঘাটের এক মিলে। অবসরে রিকশা চালাতেন। এমনকি আতঙ্কিত পুলিশও থানার জনৈক কনেস্টবল শেষে বলেই ফেললেন, 'দোহাই নাম যেন দেবেন না, বিপদে পড়ে যাব।' বাড়ানো হয়েছে পুলিশ ফোর্স, বসেছে নতুন ক্যাম্প, কিন্তু অবস্থার কোন হেরফের এতে ঘটেনি। রানাঘাটের এই সন্ত্রাস প্রসঙেগ স্থানীয় বিধায়ক গৌরকুন্ডু যা বলেছিলেন তাতে এটুকু বোঝা গিয়েছিল, "শ্রেণী বিভক্ত বুর্জোয়া সমাজের" দোহাই দিয়ে হয়তো গা বাঁচানো যায়, কিন্তু "আমরা সমাজতান্ত্রিক দেশ গড়ার পর" এগুলো থাকবে না, এই শব্দচর্চা দিয়ে অন্ততঃ সন্ত্রাস রোখা যায় না।

একদিকে পশ্চিমবঙেগর শাসক দলের আত্মতুষ্টি, ঘটনা ধামা চাপা দেবার মনোভাব, অন্যদিকে কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের 'ওরাও' কিছু করছে না স্রেফ সাফাই গাইছে, অপরদিকে কোন এক গোপণ কারণে পুলিশও প্রশাসন নিষ্ক্রিয়। এই ত্রিভুজের মাঝখানে রানাঘাটের অসংখ্য সাধারণ মানুষ আজ নীরব দর্শক। ৩ নভেম্বর বন্দিরগাছিতে দুই যুবককে বাড়ি থেকে টেনে বার করে খুন করা হয়। একই তারিখে রানাঘাট দক্ষিণপাড়ায় রাত আটটা নাগাদ বোমার আঘাতে নিহত হন লেপ প্রস্তুতকারক মহিউদ্দিন শেখ। মহিউদ্দিনের আঠার বছরের ছেলে আহত অবস্থায় পরে হাসপাতালে মারা যায়। ৫ নভেম্বর নীলু ঘোষ রামনগরে বোমার আঘাতে ঘটনাস্থলেই মারা যান। সেই দিন দু ঘন্টা পর এই ঘটনাস্থল থেকে ১০০ গজ দুরে ছুরিকাহত হয়ে নিহত হন জগদীশ দাস ও হরিশ দেবনাথ। হরিশ ছিলেন রানাঘাট

কোর্টের মুহুরী এবং জগদীশ একজন তাঁত ব্যবসায়ী। ১০ নভেম্বর আরেকটি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় চূর্ণী নদীর ধারে। পাশাপাশি বেড়েছে ডাকাতির সংখ্যাও। সর্বস্বান্ত হয়েছেন আনুলিয়ার সুরেশ বর্মন, হরিপদ বর্মন। ৩০ অক্টোবর ডাকাতদের বাধা দিতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হন আনুলিয়ার লক্ষ্মণ সেন। লুঠ হয়েছে ঘোষ কলোনীর বৈদ্যনাথ ঘোষের বাড়ি। একইভাবে সর্বশান্ত হয়েছেন পার্বতী পুরের তরণী দাস, সুবল ঘোষ ও আরও পরিবার। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে গত তিন মাসে রানাঘাটে ডাকাতির সংখ্যা গোটা চল্লিশ। পুলিশ সূত্রের খবর ৬টি। এবং পুলিশী ভাষ্যে এই সংখ্যা আরও কম হলে ক্ষতি হতো না যদি এর সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতেন। অনেকেরই অভিযোগ, অপরাধীদের নামধান আগে জানিয়েও কোন ফল হয়নি। উল্টে সেই ব্যক্তির নাম অপরাধীদের কাছে চলে গেছে। তিনি আক্রান্ত হয়েছেন। এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার পর রানাঘাট থানার এস. আই সমীর ভট্টাচার্য বললেন, 'না এসব বাজে কথা। তবে শুনছি লোকে ভয়টয় পাচ্ছে।' বিধায়ক গৌর কুন্ডুও সমর্থন জানিয়েছিলেন পুলিশী ভাষ্যে, 'রানাঘাটে সন্ত্রাস আছে বলে আমি মনে করি না। তাছাড়া পুলিশ প্রশাসন তো যথেষ্ট এ্যাকটিভ।'

কিন্তু এখানকার মানুষের বক্তব্য এর বিপরীত। থানা এমনিতেই নিষ্ক্রিয় তার উপর নিরীহ ব্যক্তিদের ধরে পুলিশ হয়রান করছে। টাকা আদায় করছে। অপরাধীদের সঙ্গে পুলিশের ওঠাবসা। নতুন জমি বা বাড়ি কিনতে গেলে বা ভাড়া নিতে গেলে মস্তানসেলামী। বিশ্বাসপাড়া, দে চৌধুরী পাড়া, দুর্গাদাস পার্কে এ অভিজ্ঞতা অনেকের। রথতলা আর মহাপ্রভু পাড়ার মুখে ইউসুফ ইনস্টিটিউশন। স্কুলের গায়েই চোলাই মদের কারবার। অথচ পুলিশ ক্যাম্প ১৫/২০ গজ দুরে। পুরনো সাব ডিভিশনাল হাসপাতালের চত্বরেও এ ঘটনা প্রকাশ্য। এমন কি জি. আর. পি অফিসের দেয়ালের পাশেই মদ তার সঙ্গে সন্ধ্যে হলেই নারীদেহের কারবার। একটু ঘোরাফেরা করলেই এ দৃশ্য আকচার নজরে পড়বে। পুলিশ সব জানে চেনে তাঁ সত্ত্বেও এই নীরবতা কেন?

রানাঘাটের অপরাধ জগত বহুমুখী। তা প্রকট হয়েছে ৭২–৭৩ থেকে। ওয়াগন ভাড়া এর অন্যতম প্রধান পথ। একশ্রেণীর বড় ব্যবসায়ীদের উৎসাহদান তার সঙ্গে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের কিছু ভবঘুরে বেপরোয়া যুবকের আঁতাত। ফলে সহজ মুনাফা আসে চাল, গম, চিনি, সিমেন্ট, কয়লা ও আরও নানা জিনিস থেকে। রানাঘাটের লোকো থেকে কয়লা চুরি প্রতিদিনের ঘটনা। এই যুবকদের মধ্যে দু–তিনজন বাদে

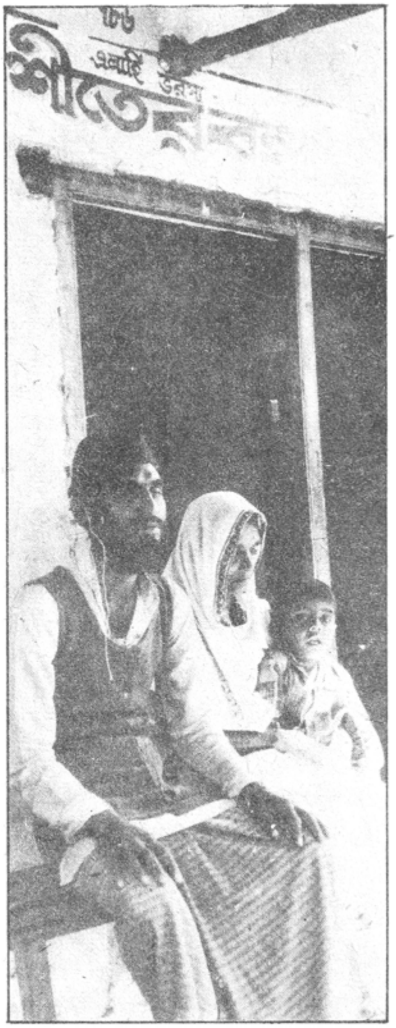

অধিকাংশেরই ঘর সংসারের পুরনো ছবি একই রয়ে গেছে। আছে পুলিশ–কোর্ট–কেসের ঝামেলা। এর উপর ক্রমশ: মদ, মেয়ে শরীরের অগাধ হাতছানি। এমন অনেককে এদের মধ্যে খুঁজলে পাওয়া যাবে যাদের এসবে হাতেখড়ি হয়েছে এই লাইনে এসে। আস্তে আস্তে তৈরি হয়েছে নেতা। দল ভেঙেছে। নিজেদের মধ্যে খুন, জখম। বর্তমানে রানাঘাটের এই অপরাধ জগত অসংখ্য দল–উপদলে বিভক্ত। স্থানীয় কিছু ঠিকাদারদের প্রশ্রয়েও গড়ে উঠেছে মস্তান বাহিনী বর্তমানে তা বুমেরাংয়ে পরিণত হয়েছে। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে রাজনীতির লোকজনের জান পহচান। তারই ফলশ্রুতিতে মাস্তানদের মাথায় উঠেছে রাজনীতির ছাতা। ক্রমশ: সরাসরি যোগাযোগে। '৭৪–৭৫ সালে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলই কুশকে দেবতা বানিয়েছিল। এখন তারা তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।' বলেছিলেন প্রশাসনের এক অফিসার। লব–কুশ এই দুই ভাই রানাঘাটের দুটি কুখ্যাত নাম। লব নিহত হয়েছে। কুশ এখন হাজতে। হিসাবের গরমিলে লবের মতো পরিণতিও এখানে কম নেই। খুন হয়েছে বরেন, অনিল, রতন, রবি, বিমল ও আরও অনেকে। রানাঘাটের অপরাধ জগতে এরা এক একটি কুখ্যাত নাম। এরা সরে যাওয়ার পর ৭৮–৭৯ থেকে প্রাধান্য বেড়েছে শ্যামলের। শোনা যায়, লব–কুশ যেমন কংগ্রেস সমর্থিত শ্যামল তেমনি সি পি এমের। স্থানীয় বাসিন্দা থেকে প্রশাসনিক স্তরে অনেকেই জানিয়েছেন ধরপাকড় হলে রাজনৈতিক মহল থেকে চাপ দেওয়া হয়। ছেড়ে দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। কিন্তু প্রচার সর্বস্ব রাজনীতির ফাটকাবাজী আর স্বার্থান্বেষী কিছু পুলিশী কুকীর্তির পরও এখানকার মানুষদের থেকে প্রশাসনের দুই ব্যক্তির কথা বারবার আমি শুনেছি। এস. ডি. ও এবং এস. ডি. পি.ও। রানাঘাটে কয়েকমাস হল এসেছেন। এঁদের উদ্যোগে এখানকার সন্ত্রাস দুদিন কিছুটা কমেছে। 'যাতে গন্ডগোল বন্ধ হয় সে ব্যাপারে সত্যিই উনি কিছু চেষ্টা করছেন।' জানিয়েছিলেন স্থানীয় এক বাসিন্দা। কথা প্রসঙ্গে এস. ডি.ও সি. এস.কে সিনহা বললেন, 'কিছু অস্বাভাবিকতা সৃষ্টি হয়েছে এটা সত্যি। আমরা সবাই চেষ্টা করছি যাতে সেটা বন্ধ করা যায়।'

রানাঘাটের পুরনো রোগ স্মাগলিং অপরাধের এই মহলটি তুলনায় অনেক বেশি সংগঠিত ও অনুত্তেজিত। সবচেয়ে চিহ্নিত জায়গা তালপুকুর অঞ্চল। রানাঘাটের স্মাগলিং জগতের শতকরা সত্তর জনেরই এখানে বাস। বাংলাদেশ থেকে হাত ঘুরে মাল পৌঁছায় কারবারীদের কাছে। টেপ রেকর্ডার, ঘড়ি, বিভিন্নরকম কাপড়, লবঙ্গ, মিল্ক পাউডার, একপ্রকার হোয়াইট মেটাল এমনকি মেডিসিনাল পাউডারও। রানাঘাট সার্কেলের কাস্টমস ইন্সপেক্টর দীপক সরকার জানিয়েছিলেন, বর্তমানে মিল্ক–পাউডার এবং হোয়াইট মেটালেরই প্রকোপ বেশি। তাঁকে জিজ্ঞাসা করাতে জানা গিয়েছিল শতকরা প্রায় পনেরজন–ই ঐ লাইনে শিক্ষিত। গ্র্যাজুয়েটও কয়েকজন আছে।' কিন্তু রানাঘাটের তালপুকুর অঞ্চলে এলে 'স্মাগলিং' নামে কোন রহস্য চোখে আসবে না। নিতান্ত মামুলি দিন আনা–খাওয়ার ছবি। খুবই নিম্নবিত্ত অঞ্চল। লাইনে আসছেন আরও নতুন নতুন লোক। কলকারখানায় চাকরি করেন এমন অনেক ব্যক্তিও পারিবারিক ভাবে এর সঙ্গে যুক্ত। রানাঘাটের কিছু রাজনৈতিক নেতার এখানে আসা–যাওয়াও কোন গোপন নয়। অপরাধীদের অন্যান্য গোষ্ঠীর মত এই স্মাগলিং চক্রও আটকে আছে এক রহস্যময় চুম্বকের গায়ে তাই তেমন সংঘাত নেই। □

এবারের নির্বাচনের খরচ পড়ছে প্রায় ১৭০ কোটি টাকার মত

বিশেষ প্রতিনিধি

লোকসভার আসন্ন নির্বাচনে এবার পাঞ্জাব ও আসাম ছাড়া সারা ভারতে নির্বাচন প্রার্থীর সংখ্যা ৫,৩১২ জন। মনোনয়নপত্র দাখিল করেও নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন ৩,৬৪৯ জন এবং ৩০৮ জনের মনোনয়ন পত্র বাতিল হয়ে গেছে। কোন কোন দলের বা প্রার্থীর ভাগ্যে জয়ের বরমাল্য জুটবে তার চূড়ান্ত ফলাফল অচিরেই জানা যাবে। যুযুধান সব পক্ষই এখন লড়াইয়ের ময়দানে। কিন্তু ভারতের মত দেশে নির্বাচনের জন্য হালফিল খরচের বহরটা যে কি দাঁড়াচ্ছে তা সম্ভবত অনেকেই খেয়াল করেন না। নির্বাচনী ব্যয়ের একটা পরিসংখ্যান খতিয়ে দেখলে এর একটা সম্ভাব্য চিত্র সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫২ সালে। খরচ হয়েছিল ১০.৪৫ কোটি টাকা। এর পরবর্তী দুটি নির্বাচনে খরচ অনেকটা কমে ১৯৫৭ সালে দাঁড়ায় ৫.৯০ কোটি এবং ১৯৬২তে ৭.৩১ কোটি টাকায়। তারপর থেকেই নির্বাচনী ব্যয় ক্রমশই উর্দ্ধগামী। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের খরচ ছিল ১০.৯৫ কোটি টাকা। ১৯৭১ সালে ইলেকট্রোরাল রোলের সংশোধনের এবং উড়িষ্যা, তামিলনাড়ু এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন একত্রে অনুষ্ঠিত হওয়াও তার খরচ সমেত ব্যয় হয়েছিল ১৪.৪৩ কোটি টাকা। ১৯৭৭ সালেও লোকসভা নির্বাচনের সাথে কেরল রাজ্য বিধানসভারও নির্বাচন হয়। খরচ পড়ে ২৯.৮১ কোটি টাকা। কিন্তু তার পরবর্তী নির্বাচনে অর্থাৎ ১৯৮০ সালে তা এক রেকর্ড মাত্রায় এসে পৌছে খরচ হয় ৫৫.৯৭ কোটি টাকা।

এই বিশাল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন কিসে হয় সে সম্পর্কে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে মনে। ১৯৭১ থেকে ১৯৮০ – এই তিনটি নির্বাচনের খরচের উল্লিখিত হিসেবটা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে একটি থেকে পরবর্তী নির্বাচনে খরচের পরিমাণ বাড়ছে প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ। ভোটের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি— যেমন কাগজ, ছাপাইয়ের খরচ, পরিবহণের ব্যয় ক্রমেই বেড়ে চলেছে। আর সেই ধাক্কাটা এসে পড়ছে নির্বাচনী ব্যয়ের ওপরেও। এছাড়া মোটা যে খরচ সাধারণত হয়ে থাকে তা হল—প্রতিটি নির্বাচনী কেন্দ্রের জন্য যতদূর সম্ভব বেশি পোলিং বুথের ব্যবস্থা করা –সেগুলির ঠিকমত তত্ত্বাবধান, পরিচালন ও সুরক্ষার ব্যবস্থা, ব্যালট বাক্স, ব্যালট পেপারের খরচ এবং ব্যালট বাক্স প্রতিটি পোলিং বুথে পৌছে দেওয়া এবং নির্বাচনের পর ভোট গণনা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া, নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা— এইসব কিছুর জন্য টাকা তো খরচ হবেই। এছাড়া রয়েছে কিছু আনুষঙ্গিক ব্যয় এবং নির্বাচনী কমিশনের দ্বারা প্রচারিত পোস্টার এবং বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ প্রভৃতির খরচ।

এ বছরের সম্ভাব্য নির্বাচনের প্রতি নজর রেখে কেন্দ্রীয় বাজেটে ৬৫ কোটি টাকার সংস্থানও রাখা হয়েছে। আসাম এবং পাঞ্জাব বাদে সারা ভারতে ৫১৫টি লোকসভা আসনে প্রার্থী নির্বাচনের জন্য ভোটাধিকার প্রাপ্ত প্রায় ৩৩ কোটি লোকের এবারে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবার কথা। তাই যদি ধরে নেওয়া যায় যে গড়ে প্রায় ৫০ শতাংশ ভোটদাতা এবার ভোট দেবেন তবে ভোট পিছু সরকারের গড়পড়তা খরচ প্রায় ৪ টাকা করে পড়বার কথা। ভোটারের সংখ্যা বেশি হলে খরচটাও কমে আসবে।

এ তো গেল নির্বাচনি খরচার সরকারী দিক। কিন্তু নির্বাচন যুদ্ধে প্রতিটি দলের এবং প্রার্থীদের পক্ষ থেকে যে খরচটা করা হয় তার পরিমাণ কতখানি। এ ব্যাপারে গোপন কথা ফাঁস করতে কোন দলই রাজী হবেন না। তাই ভোটের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় খরচের একটা তালিকা এবং দল ও প্রার্থী ভিত্তিক খরচের সম্ভাব্য হার ও পূর্ব অভিজ্ঞতা যোগ করে মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে আসা যায়। এবং বলাই বাহুল্য যে এবারের নির্বাচনে দৃষ্টি সজাগ রাখলে বুঝতে অসুবিধা হবে না যে সম্ভাব্য খরচের যে তালিকা এই প্রতিবেদনে পেশ করা হচ্ছে তা নিছক কল্পনাপ্রসূত গালগল্প নয়।

নির্বাচনের প্রস্তুতির জন্য প্রতিটি প্রার্থীকে এবং তাঁর দলবলের লোকদের নির্বাচনী এলাকায় নিয়মিত প্রচারাভিযান চালাতে হয়। নির্বাচনী এলাকা জুড়ে দেওয়ালের লিখন, পোস্টার, দলীয় পতাকা প্রদর্শন, বাড়ি বাড়ি ঘোরা, বক্তৃতা সভার আয়োজন, মঞ্চ নির্মাণ, মাইক, আলো, মোটরগাড়ি বা জীপের ব্যবস্থা এবং কর্মীদের ভাতা ও খাইখরচ বাবদ একটা মোটা অঙ্কের টাকার প্রয়োজন। ভোটারদের মতিগতি পাল্টাচ্ছে। শুধুমাত্র কমিটেড ভোটারের ওপর নির্ভর করে নির্বাচন জেতার ঝুঁকি আজকাল কেউ আর নিতে চান না। প্রার্থীদের স্বপক্ষে হাওয়া ঘোরাতেই হয়। তাই যুক্তি, আশ্বাস ছাড়াও বিভিন্ন উপায়ে ভোটারদের মন জয় করে নেবার প্রচেষ্টাও সাথে সাথেই চলে। আর এই মন জয় করার ব্যাপারটা যে কি বস্ত তার আর বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজন করে না।

নির্বাচনী ব্যয়ের একটা সীমা আমাদের দেশে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে এক একজন প্রার্থীর খরচের সীমা প্রথমে করা হয়েছিল ২৫ হাজার টাকা। সবকিছুর মূল্য বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে পরে তা বাড়িয়ে করা হয় ৩৫ হাজার টাকা এবং বর্তমানে সেই সীমা হচ্ছে ১.৫ লাখ টাকা। বর্তমানের বিশাল নির্বাচন যজ্ঞে এই টাকাটা গোষ্পদে জলের মতই। তাই এগিয়ে আসতে হয় দলকে – বাকী টাকার জোগান দিতে।

এবারে বিভিন্ন খাতে বাজারদর অনুযায়ী প্রার্থী পিছু সম্ভাব্য খরচের আনুমানিক হিসাবটা একটু পর্যালোচনা করা যাক।

১। নির্বাচনী প্রস্তুতি এবং কর্মীদের খরচ	২ লাখ টাকা
২। মোটরগাড়ি বা জীপের ভাড়া (ড্রাইভারের মাইনে এবং মেরামতি খরচ নিয়ে)	৭০ থেকে ৮০ হাজার ,,
৩। মঞ্চ নির্মাণ, মাইক্রোফোন, আলো	১ লাখ ৫০ হাজার ,,
৪। ব্যানার, পোস্টার, প্রচার পত্র (ছাপাই, কাপড়, কাগজ এবং টাঙগাবার দামসহ)	১ লাখ ৫০ হাজার ,,
মোট	৫ লাখ ৮০ হাজার
বা	৬ লাখ টাকার মত

অবশ্য প্রধান প্রধান দল ছাড়া এই টাকা ছোটখাট দল বা প্রার্থীর পক্ষে খরচ করা সম্ভব না হলেও তাদেরও বেশ ভাল টাকা ব্যয় করতে হয়। কিন্তু কংগ্রেস (আই) এবং প্রধান বিরোধী প্রার্থীর এক একজনের খরচটা মোটামুটি এই রকমের। ক্ষেত্র বিশেষে খরচের মাত্রা বাড়ে বই কমে না। প্রতিটি কেন্দ্রে প্রধান দুই প্রার্থী ছাড়াও এবারে প্রচুর পরিমাণ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হচ্ছেন। কেন্দ্র পিছু গড়ে প্রার্থীর সংখ্যা ১০ জন। উত্তর প্রদেশে তা ১৫ জন। তাই কেন্দ্র পিছু খরচের মাত্রাটা হবে নিম্নরূপ :

কংগ্রেস (আই)	৭ লাখ
প্রধান বিরোধী প্রার্থী	৫ লাখ
অন্যান্য প্রার্থীদের মিলিয়ে	
মোট খরচ	৬ লাখ
কেন্দ্র প্রতি	১৮ লাখ

এই খরচের মাত্রাটা ক্ষেত্র বিশেষে বেশি কম হলেও একটা মোট গড় হিসাব মতে ন্যূনতম পক্ষে দাঁড়াবে ১৮ লাখ টাকার মত। তাহলে ৫১৫টি নির্বাচনী কেন্দ্র মিলে নির্বাচনের ন্যূনতম খরচা পড়ছে প্রায় ১০০ কোটি টাকার মত। এই টাকার সংগে সরকারি খরচ (বাজেটের সংস্হান অনুযায়ী) ৬৫ কোটি টাকা ধরলে মোট খরচ দাঁড়াচ্ছে ১৬৫ কোটি টাকা।

এই আনুমানিক হিসাবটা যে নিছক উদ্ভট কল্পনা নয় তার প্রমাণ মিলবে সম্প্রতি দিল্লির একটি প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রে প্রকাশিত কংগ্রেস (আই) দলের নির্বাচনের সম্ভাব্য খরচের তালিকা থেকে। কংগ্রেস (আই) থেকে সেই তথ্য সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্য করা হয় নি।

সংবাদে প্রকাশ যে প্রতিটি নির্বাচনী কেন্দ্রে কংগ্রেস (আই) প্রার্থীদের জন্য ভোটদানের আবেদন সহ সাধারণ পোস্টার পাঠান হচ্ছে ২০ হাজার করে। তাছাড়া প্রয়াত শ্রীমতী গান্ধীর ছবি এবং প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর ছবি সহ (২।৩ রংয়ের) আরো ১০ হাজার পোস্টার। যাচ্ছে কেন্দ্র প্রতি ২ হাজার ব্যানার, ৫ হাজার দলীয় পতাকা এবং ১০ হাজার করে প্লাস্টিক ব্যাজ। বিতরণের জন্যে তৈরি করা হয়েছে ১.৫ লাখ বিন্দি (মেয়েদের কপালের টিপ)। প্রতিটি কেন্দ্রে ১০ থেকে ১২টি জীপগাড়ি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এক একজন প্রার্থীকে তিনটি স্তরে প্রায় ৭ লাখ টাকার মত নির্বাচনী খরচ দেওয়া হচ্ছে। এর সংগে রয়েছে শ্রীমতী গান্ধীর বক্তৃতামালার ক্যাসেট এবং সংবাদপত্রে প্রায় পাতাজোড়া বিজ্ঞাপন।

কংগ্রেস (আই) দলের এই বিশাল প্রস্তুতির সংগে পাল্লা দিয়ে বিপক্ষীয় দলগুলিকেও কোমড় বেঁধে আসরে নামতে হয়েছে খরচের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। ভারতীয় জনতা পার্টিও সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিতে শুরু করেছেন। ভারতীয় জনতা পার্টি, জনতা এবং ডি এম কে পি-র কেন্দ্রওয়াড়ী খরচ কংগ্রেস (আই) এর মত এত বিশাল না হলেও খরচ করতে হবে এই প্রতিবেদনের সম্ভাব্য হিসাব মতই। নির্বাচনী খরচার এই বাড়তি ঝোঁক থেকে পশ্চিমবাংলার সি পি এমও মুক্ত নয়। কেননা মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর জন্য হেলিকপ্টার ভাড়ার ব্যবস্হা তো করাই হচ্ছিল। আর সে টাকা যেত দলেরই তহবিল থেকে। দৈনিক ৫।৬ ঘণ্টা হিসাবে হেলিকপ্টার ভাড়া কত পড়তে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

অতএব দেখা যাচ্ছে সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণের বেশ কিছুটা বাদ দিলেও প্রার্থী প্রতি কংগ্রেস (আই) দলের খরচ প্রতিবেদনের হিসাবের অনেক বেশি। অন্যান্য দলের খরচের পরিমাণ কিছুটা যদি কমও ধরা যায় তাহলেও কিন্তু কোনমতেই সব মিলিয়ে নির্বাচনী খরচ এবার ১৬৫ থেকে ১৭০ কোটি টাকার কম হবে না।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্হায় জনপ্রতিনিধি একটা অবশ্য প্রয়োজনীয় ব্যাপার। কিন্তু এই হারে নির্বাচনী ব্যয় যদি বাড়তে থাকে তবে ভবিষ্যতে তা কি আকার ধারণ করবে তা অনুমান করতে অসুবিধা হয় না। অবশ্য অনেকে বলতে পারেন যে দেশে কন্যা পাত্রস্থ করতে ৩০ হাজার থেকে ২।৩ লাখ পর্যন্ত ব্যয় হয় সেখানে এই খরচা তেমন বেশি আর কি? □

লোকসভা নির্বাচনের ক্রমবর্দ্ধমান খরচ (কোটি টাকায়)

১৯৫২	১৯৫৭	১৯৬২	১৯৬৭	১৯৭১	১৯৭৭	১৯৮০
১০.৪৫	৫.৯০	৭.৩১	১০.৯৫	১৪.৪৩	২৯.৮১	৫৫.৯৭

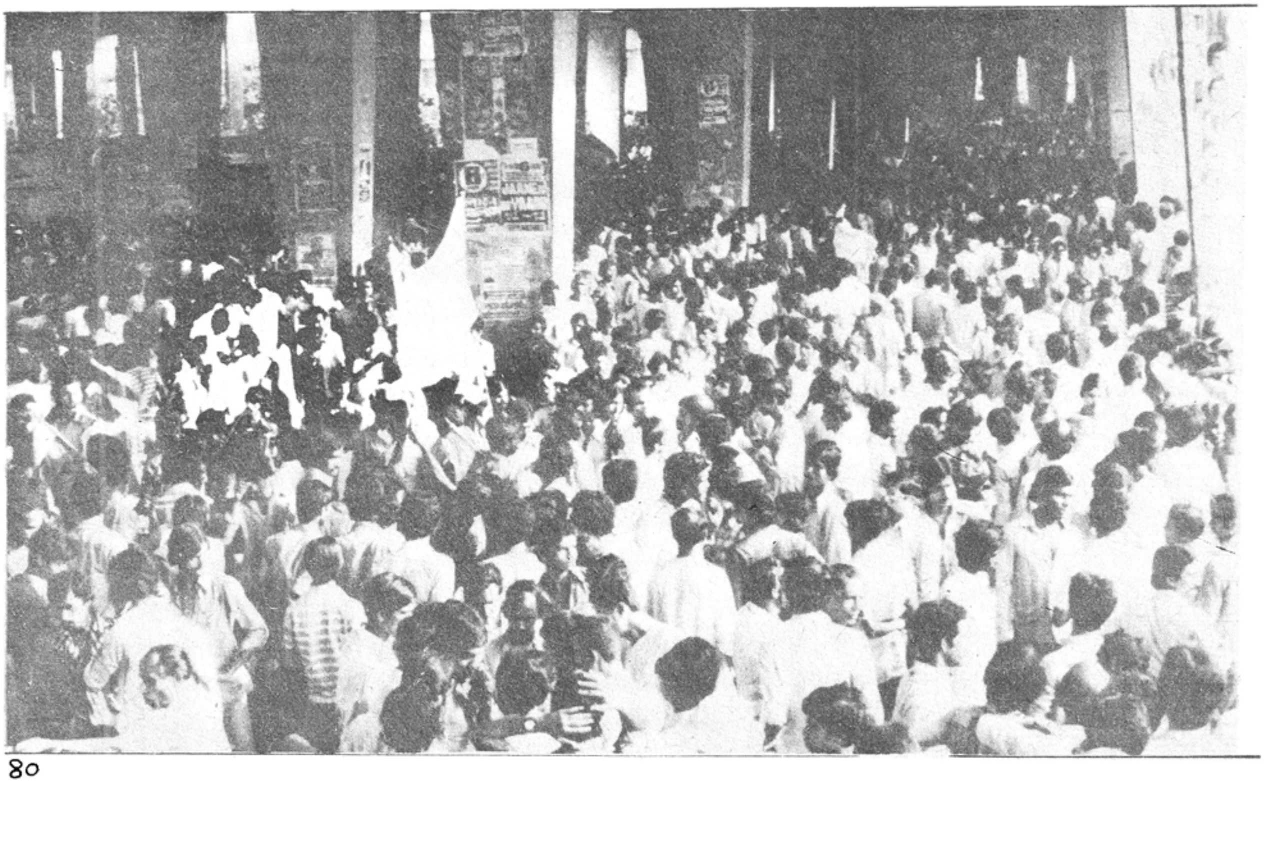

ফায়ার কনসাসনেস এত কম কেন?

অভীক রায়

হাওড়া ব্রিজে প্রতি বছর পাঁচ সাত জন লোক ওঠে। এরা অবশ্য প্রায় সকলেই পাগল কেননা পাগল ছাড়া কেউ এধরনের বিপজ্জনক ব্যাপারে ঝুঁকি নেয় না। আত্মহত্যা করার মতলব নিয়েও অবশ্য কেউ কেউ ওঠে কিন্তু, যারাই উঠুক তাদের বাঁচাতে গিয়ে দমকল কর্মীদের অনেকখানি ঝুঁকি নিতে হয়। দমকল-কর্মীদের তারা ওপর থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা পর্যন্ত করে। এমনও হয়েছে ব্রিজের ওপরে সেই লোকটি ছুটোছুটি শুরু করে দিয়েছে। পেছন পেছন দমকল কর্মীরাও ছুটছেন।

দমকলকর্মীদের আসল কাজ আগুন নিয়ে। আগুনের সঙ্গে তাঁদের প্রধান সম্পর্ক। কিন্তু তাহলেও পথদুর্ঘটনা, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া কিংবা পুরনো বাড়ি ভেঙে পড়া সব ব্যাপারেই দমকলের একটা সরাসরি ভূমিকা থাকে। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা ছুটে যান। এমনকি জলে ডোবার ব্যাপারেও কাজ করার যথেষ্ট ইচ্ছে তাঁদের রয়েছে কিন্তু ভাল ইকুইপমেন্টের অভাবের দরুণ কাজ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় না। বিদেশী ইকুইপমেন্ট ছাড়া এ ধরনের কাজে নামা যাবে না। কিন্তু সরকারের আর্থিক অবস্থা ভাল না হওয়ার দরুণ বিদেশী জিনিষপত্র আনানো সম্ভব নয়।

খোঁজ খবর করে জানা গেল ১৯৮৩ সালে গোটা পশ্চিমবঙ্গে আগুনে পুড়ে মারা গেছেন সাতান্ন জন। এ বছরের হিসেব অবশ্য এখনও তৈরি হয় নি। তবে দমকলবাহিনীর মতে প্রতি বছরে গড়ে এই সংখ্যক মানুষই আগুনে পুড়ে মারা যান। গত বছর অর্থাৎ ১৯৮৩ সালে টোটাল কল পশ্চিমবঙ্গ দমকলবাহিনী পেয়েছিলেন। ৬১৭৩। তার মধ্যে ফায়ারকেস ৩৮৩০ পথদুর্ঘটনা কিংবা পুরনো বাড়ি ভেঙে পড়া জাতীয় কেস ৯৯৭, স্পেশাল কেস ২৩৩ আর ফলস্ এ্যালার্ম ১১১৩। ফলস্ এ্যালার্ম কিন্তু শুধু দমকলকর্মীদের হ্যারাস করার জন্য নয়। গুড ইনটেনশন থেকেও অনেকে ডেকে বসে। আগুন লাগে নি অথচ লেগে যেতে পারে এই ভয় থেকে আর কি। বুঝুক না বুঝুক লোকটি যে ফায়ার কনসাস সেটি আঁচ করা যায়। আসলে ফায়ার কনসাসনেস একটা বড় কথা। আমাদের দেশে অনেকেরই এটা নেই। অথচ সাধারণ মানুষের মধ্যে ফায়ার কনসাসনেস বাড়ানোর জন্য দমকল থেকে অনেক রকম চেষ্টা করা হয়, এমন কি প্রতি বছর ১৪ই এপ্রিল তাঁরা অগ্নিনিরোধক দিবস পালন করেন। মানুষকে বহুভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় লাভ তাতে খুব একটা হয় না। তবু আগুন লাগে এবং দুর্ঘটনাও ঘটে। আর বহু ক্ষেত্রে সেই দুর্ঘটনা ঘটে আমাদের নিজেদেরই ভুলে। এসব দুর্ঘটনার জন্য প্রকৃতপক্ষে আমরাই দায়ী। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য পশ্চিমবঙ্গ দমকলবাহিনীর ডিরেক্টর কল্যাণকুমার দাশগুপ্তের ধারণা, প্রচুর লিমিটেশন থাকা সত্ত্বেও দমকল এ রাজ্যে যথেষ্ট সাকসেসফুলি কাজ করতে পারছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে ফায়ার কনসাসনেসের ঘাটতির ব্যাপারটা নিয়ে কল্যাণবাবু খুব চিন্তিত। বিষণ্ণ ভাবে বললেন, দেশে শিক্ষা দীক্ষা বাড়ছে, শিক্ষিতের হার বাড়ছে কিন্তু ফায়ার কনসাসনেস এত কম কেন? □

আগুন নিয়ে যাঁদের খেলা

এবার আগুন নিয়ে যাঁরা চব্বিশ ঘণ্টা খেলছেন, দমকলের সেই সাধারণ কর্মীদের দিকে তাকানো যাক। এঁদের ঝুঁকি অনেক রকম। কিন্তু সবচাইতে বড় ঝুঁকি পাবলিক। অন্তত: পঞ্চাশ জন। দমকল কর্মী আমার কাছে একথা কবুল করেছেন। এঁদের অভিযোগ লোকে দমকলকে বুঝবার চেষ্টা করে না। আগুন নেভানোর জন্য আসতে একটু দেরি হলেই অস্থির জনতা ক্রুদ্ধ মারমুখী হয়ে ওঠে। অথচ খবর পাওয়ার তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে গাড়ি নিয়ে তাঁরা বেরিয়ে পড়েন। কলকাতার যানজট দিন দিন কি ভয়াবহ চেহারা নিচ্ছে তা সকলেরই জানা। এই নিদারুন জট ছাড়িয়ে বহু ক্ষেত্রে তাঁদের এক পা এক পা করে এগোতে হয়। অবিশ্রান্ত ঘন্টি দিলেও আজকাল তেমন কাজ হয় না। ফলে অকুস্থলে পৌঁছোতে একটু দেরি হয়ে যায়। শুধু যানজটে নয় ঠিকানারাও একটা সমস্যা থাকে। দমকলে খবর দেওয়ার সময় অনেকেই পরিষ্কার ভাবে পুরো ঠিকানা বলেন না। যেমন পঞ্চাননতলা নামে কোন জায়গায় যদি আগুন লাগে তাহলে বলা উচিত কোন পঞ্চাননতলা। কলকাতায় অন্তত: তিনটে পঞ্চাননতলা আছে। অথবা অনেকে শুধু বাড়ির নম্বর আর রাস্তা বলেই ফোন ছেড়ে দেন। রাস্তাটা হয়তো কোন বাই লেন। এরকম রাশি রাশি বাই লেনের অভাব কলকাতায় নেই। হেঁয়ালির মধ্যে না রেখে বাড়ি বা দোকানের ডিরেকশনটা দমকলকে পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু আমরা অনেকেই সেটা করি না। দমকলকর্মীরা এ ব্যাপারে খুবই ক্ষুব্ধ। তাঁদের ধারণা এদেশে দমকলকর্মীদের কোন সিকিউরিটি নেই। পাবলিকের কাছে প্রায়ই তাঁদের মারধোর খেতে হয়। নিয়ম হচ্ছে দমকল যেখানে যাবে পুলিশও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সেখানে পৌঁছোবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা হয় না। প্রায়ই দেখা যায় দমকলকর্মীরা মারধোর খাওয়ার বেশ কিছুক্ষণবাদে পুলিশ সেখানে হাজির হয়। অথচ দমকলকর্মীদের নিরাপত্তার দায়িত্ব পুলিশের কিন্তু খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছোতে পুলিশের যে কি অসুবিধে সেটা অনেক দমকলকর্মী জানেন না। মাঝখান থেকে প্রায় ক্ষেত্রেই তাঁরা উন্মত্ত জনতার হাতে অকারণে নিগৃহীত হন। তাঁদেরই এই অসহায় অবস্থার ব্যাপারে সরকারকে তাঁরা অনেকদিন ধরেই জানিয়ে আসছেন কিন্তু এখনও ফল কিছু হয় নি। অর্থাৎ নিরাপত্তার কোন সুস্থ প্রতিশ্রুতি এখনও তাঁরা পান নি। পুলিশের মত দমকলকর্মীদের হাতে কোন অস্ত্র থাকে না। সুতরাং তাঁদের মারধোর করা অনেক সহজ। রাজ্যসরকার কি এটা জানেন না? ইচ্ছে করলে তাঁরা কিন্তু এ বিষয়ে একটি সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারেন। অন্তত: নেওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি।

নিগৃহীত হওয়ার ঘটনা ছাড়াও আগুন নেভানোর সময় সাধারণ মানুষ নানাভাবে দমকলের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। আসলে এ সবই ঘটে লোকের ফায়ার কনসাসনেস না থাকার জন্য। এমনিতেই ভালভাবে কাজ করার মত উপযুক্ত যন্ত্রপাতির যথেষ্ট অভাব এখানে। জীবনের ঝুঁকি তো আছেই সেই সঙ্গে বহুরকম অসুবিধের মধ্যে তাঁদের কাজ করতে হয়। কলকাতায় আজকাল জলও ঠিকমতো পাওয়া যায় না। গঙ্গার বেডও খানিকটা নেমে গেছে। জলের অভাবে কাজের সমস্যা হবেই। অনেক ক্ষেত্রেই রিলেসিস্টেমে তাঁদের জল আনতে হয়। জল হয়তো রয়েছে বহুদূরে পরপর অনেকগুলি গাড়ি দাঁড় করিয়ে এক গাড়ি থেকে আরেক গাড়ি এভাবে জল নিয়ে আসতে হয়। আবার গ্রামাঞ্চলে কোন

জায়গায় যদি আগুন লাগে তাহলে পৌঁছোতে দেরি যেমন হয় তেমনি জলও অনেকসময় একেবারে পাওয়াই যায় না। দমকলকর্মীদের সে এক নিদারুণ অসহায় অবস্থা। গাড়িতে যেটুকু জল থাকে সেটাই সবসময় পর্যাপ্ত হয় না। কিন্তু সাধারণ মানুষ তো সেকথা শুনবে না। আগুন নেভাতে দেরি হচ্ছে এটাই তাদের কাছে বড় কথা। সমস্ত ক্রোধ গিয়ে পড়ে দমকলের ওপর। এই ক্রোধের স্বীকার হয়ে দমকলকর্মীর মৃত্যু হয়েছে এমন ঘটনাও পশ্চিমবঙ্গে ঘটেছে।

কর্মরত অবস্থায় যদি কোন দুর্ঘটনায় কোন দমকলকর্মী পঙ্গু হয়ে পড়েন, তাহলে তাঁকে অপেক্ষাকৃত হাল্কা কাজ অর্থাৎ দশটা পাঁচটা ডিউটিতে রেখে দেওয়া হয়। আর যদি মারা যান তাহলে তাঁর বাড়ির কেউ চাকরি পান। কিন্তু ছুটি বলে এঁদের কিছু নেই। বেড়াতে গেলেও কোথায় যাচ্ছেন না যাচ্ছেন সব অফিসে জানিয়ে যেতে হয়। দরকার হলেই যখন তখন তাঁদের ডেকে নিয়ে আসার অধিকার সরকারের আছে। যে কোন অবস্থায় কাজ করতে এঁরা বাধ্য।

সম্প্রতি দমকলে ওয়ারলেস চালু হয়েছে। প্রতিটি দমকলকর্মীই এজন্যে বামফ্রন্ট সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ। ওয়ারলেস না থাকার দরুণ আগে খুবই অসুবিধে হত। জরুরী পরিস্থিতিতে ঠিকভাবে কাজ করা যেত না। কিন্তু এখন সে অসুবিধে ৩১ অক্টোবর এবং ১ নভেম্বর অর্থাৎ ইন্দিরা গান্ধীর হত্যার দিন এবং তার পরের দিন দমকল কর্মীদের ফায়ার-টু-ফায়ার কাজ করতে হয়েছে। অফিসে কেউ ফিরতে পারেন নি। সারাদিন শুধু এ আগুন থেকে সে আগুন ছুটোছুটি করেছেন। ওয়ারলেস না থাকলে ওই পরিস্থিতিতে কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়ত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ৩১ অক্টোবর কলকাতায় বার্ণকেস হয়েছে ৪৫, শহরতলী অঞ্চলে ১৩ এবং দুর্গাপুর বেল্ট অর্থাৎ বর্ধমান আসানসোল এসব জায়গা মিলিয়ে ১৯ এবং ১ নভেম্বর এই হিসেবে যথাক্রমে ৩০, ১১ এবং ৩৫। এই দুদিনে দমকলের কয়েকটি গাড়ি নষ্ট হয়ে গেছে এবং বেশ কিছু কর্মী আহত হয়েছেন। তবে স্বস্তির কথা এই দুদিন তাঁদের সঙ্গে পুলিশ সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন। অবশ্য এই দুদিনে কাজে তাঁরা বাধাও পেয়েছেন বিস্তর। বহু ক্ষেত্রে তাঁদের সরাসরি ফিরে আসতে হয়েছে। কেননা হিংস্র জনতার সঙ্গে সবসময় লড়াই করে কাজ করা সম্ভব হয় না।

কিন্তু এই দুদিন না হয় ব্যতিক্রম। বছরের অন্য সময়গুলি? আমরা কি একটু তাঁদের সঙ্গে সহৃদয় সহযোগিতা করতে পারি না? কথা বলার সময় দমকলের এক তরুণ কর্মী দু:খিত ভাবে বললেন, একে তো মানুষের ফায়ার কনসাসনেস নেই তার ওপর সবসময় আমাদের এধরনের নিরাপত্তাহীন বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে কাজ করতে হয় কাঁহাতক ভাল লাগে বলুন তো। সাধারণ মানুষের সেবার জন্যই আমরা আছি। কিন্তু তাঁরা কি কোনদিন আমাদের বুঝবেন না? □

রক্ত দিয়ে শুরু রক্ত দিয়ে শেষ

ধীরানন্দ রায়

চুরাশি সাল যে মৃত্যু দিয়ে শুরু হয়েছে আর মৃত্যুতেই তার যে সমাপ্তি ঘটছে, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই।

এই ধরুন না, চুরাশির জানুয়ারীর প্রথমেই নাইজেরিয়ায় ক্যু ঘটেছে। তিউনিসিয়ায় ঘটেছে খাদ্য-দাঙ্গা, সিরিয়ার ওপর ইস্রায়েলী হামলা হয়েছে। বাজে যুদ্ধ আর সোমালিয়ার ওপর ইথিওপিয়ার বিমান আক্রমণ একই সময়ে শুরু হয়েছে। সালটি ফুরিয়ে যাবার মুখে ইন্দিরা গান্ধী খতম হলেন।

ঐ একই মাসে তৃতীয় দুনিয়ায় হাজার হাজার মানুষ মরেছে যারা বাঁচতে পারত, অবস্থাটা একটু অন্য রকমের হলে।

বিশ্বের খবর-খানা থেকে ভারেতর যে ছবিটি ওই জানুয়ারী মাসেই বেরিয়ে আসে, তাতেও দেখি নরহত্যার ঘাটতি কিছু নেই। বিহারের পিপারিয়া গ্রামে নরমেধ যজ্ঞ ঘটে গেল। তাতে কিশোর-কিশোরীরাও রেহাই পেল না। আর এ মাসের প্রথম পলিটিকাল হত্যা ঘটল মণিপুরে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সাইজা নিহত হলেন।

এই এতগুলো হত্যা, চুরাশির প্রথম মাসটিতেই ঘটে যায়।

রক্তের এই ধারাটি পরবর্তী মাসগুলোতেও থামেনি। অব্যাহত গতিতেই চলেছে। পরের মাস অর্থাৎ ফেব্রুয়ারীতে নিহত হলেন, লন্ডনে ভারতীয় দূতাবাসকর্মী রবীন্দ্র হরেশ্বর মাত্রে এবং আরো একজন। এরই প্রতিক্রিয়ায় ভারতে এক সপ্তার মধ্যে কাশ্মীরের মকবুল বাটের ফাঁসী হল।

কলকাতার দুধের ছেলে উজ্জ্বল মন্ডলকে খুন করল একজন অর্থলোভী ঘাতক।

এমনিতর ঘাতক বৃত্তি এ বছরের প্রতি মাসেই তার বীভৎসতার কালো ডানা মেলে উড়ে চলে এসেছে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের কালসীমা পেরিয়ে। চুরাশির দিনগুলোকে তাই ঘাতকাধিকারের বছর বলে উল্লেখ করলে ভুল হবে না। জুনের পাঞ্জাব আর অক্টোবরের নয়া দিল্লীকে চোখের সামনে রাখলে।

কিন্তু কেন এই রক্তস্রোত? কেন এই হত্যার মেলা? এর উত্তর কেবল একটাই – পৃথিবীর সমগ্র রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আজ এমন এক ঘুন ধরেছে, যা নররক্ত আর পৈশাচিক বর্বরতা ছাড়া কিছুতেই টিকতে পারে না।

একটা তথ্য দিলে হয়ত ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে।

গোটা আফ্রিকায় এখন দুর্ভিক্ষ চলছে। অনাহারে, এ বছর ৫ কোটিরও বেশি মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। এদের প্রাণ কিন্তু বাঁচানো যেত।

কি ভাবে?

এ বছরের প্রত্যেক দিন, ২৫০ কোটি ডলার খরচ করা হয়েছে সমরাস্ত্র উৎপাদনে। এই অপব্যয়ের একটা ক্ষুদ্র অংশ ব্যয় করলে বিশ্বের দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষগুলো বাঁচত।

কেমন করে?

দেখুন তাহলে। যুদ্ধের প্রয়োজনে যে এয়ার ক্রাফট কেরিয়ার তৈরি হয় – তার দামে ২৮ লাখ টন গম মেলে। একটা জেট বিমানের দামে এক লাখ টন চিনি পাওয়া যায়।

কিন্তু অনাহার ক্লিষ্ট মানুষের জন্য খাদ্য মেলেনি – তার বদলে মিলেছে গোলা-বারুদ-মারণাস্ত্র।

লোভ আর লাভের রাষ্ট্রযন্ত্র এই মুহূর্তে জীবনের পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে। ওদের গোলায় তাই খাদ্য নেই। আছে ডিনামাইট-এটম্ বোম। বিশ্বের প্রতিটি মানুষকে রেণু রেণু করে উড়িয়ে দেবার জন্য মাথা পিছু চার টন করে টি এন টি জাতীয় বিস্ফোরক পদার্থ সঞ্চিত আছে।

সারা বিশ্বের হত্যা কান্ড তো এরই ফলশ্রুতি। চুরাশির রক্তের বন্যা এই সমর সজ্জার অন্ধ প্রাঙ্গন হতেই উৎসারিত। একে রোধ করবে কে? পঁচাশি সাল? – কে জানে! □

নির্বাচনী ব্যবস্থায় দুর্নীতি, দলবাজি

নির্বাচন শেষ। ঝড়ের পর সর্বত্র থমথমে ভাব। সকলেরই চোখ এখন নির্বাচনী ফলাফলের দিকে। কিন্তু এতবড় নির্বাচন এরাজ্যে হল কি ভাবে? 'শনিবারের চিঠি'র প্রতিবেদকেরা বিভিন্ন দপ্তর থেকে যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তা থেকে খুঁটি–নাটি অনেককিছু জানা যাবে। জানা যাবে, যে বিরাট অঙ্কের টাকা খরচ হয়, তার অনেকটাই অপ্রয়োজনীয়, অর্থহীন।

নয়া দিল্লির নির্বাচন ভবন থেকে রাজ্যসমূহের নির্বাচন দপ্তরে রেডিওগ্রাম এল। ভোটার তালিকা তৈরি রাখুন। রাজ্য দপ্তর থেকে এই নির্দেশই চলে গেল জেলায় জেলায় মহকুমায় মহকুমায়। নির্বাচন অফিসারদের কাছে। ডি. ই. ও অথবা ই আর ও, আসলে এস. ডি. ও অথবা ডি. এম। কলকাতায় কালেকটর অব ক্যালকাটা, ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন কালেকটর, জয়েন্ট ডিরেকটর অব পঞ্চায়েত, রেজিস্ট্রার অব অ্যাসিওয়েন্স, ডেপুটি ডিরেকটর অব ল্যান্ড রেকর্ডস অ্যান্ড সার্ভে।

আর দেরি না। শুরু হল বিরাট কর্মযজ্ঞ। নির্বাচন বলে কথা। কিন্তু শুরু কর বললেই তো শুরু করা যায় না। প্রস্তুতি চাই। চাই কাগজ, চাই কলম এবং লোকজন। কাগজ মানে এনুমারেশন প্যাড, কলম মানে ডটপেন। লোকজন বলতে এনুমারেটর। সেই সঙ্গে চাই প্রচুর পরিমাণে কার্বন পেপার।

খবর রটে যেতে দেরি হয় না। অনেকেই তক্কে তক্কে ছিলেন। এনুমারেশন প্যাড ছাপা আর বাঁধাইয়ের জন্য ছাপাখানার মালিকেরা ঘোরাঘুরি শুরু করে দেন। বিদ্যেবুদ্ধি, পূর্বঅভিজ্ঞতার জমিপত্র নিয়ে দলে দলে ছেলেমেয়েরাও হাজির। ডটপেন আর কার্বন পেপার লোকাল পারচেজ হবে। সর্বত্রই কোন একজন কর্মীর উপর এই দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। অন্যেরা কাগজপত্র তৈরি করতে থাকেন।

ক্যালকাটা কালেকটরেটের দিকে তাকালেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে। ওখানে যেমন ভাবে কাজ হয়, অন্য কেন্দ্রগুলোতেও সেই রকম ভাবেই হয়। আগে কাজ চলত নিয়ম মাফিক। কালেকটরেটের তখন একটা সুনামও ছিল। এখন সব সময়ে কাজ চলে জরুরি ভিত্তিতে। অর্থাৎ সব কিছুতেই তাড়াহুড়ো। অতএব দুর্নীতি। এনুমারেশন প্যাড ছাপা ও বাঁধাইয়ের জন্য নিয়ম মাফিক টেন্ডার ডাকা হয় ঠিকই। কিন্তু কনট্রাক্ট কার কপালে জুটবে তা আগে থেকেই জানাজানি হয়ে যায়। প্রয়োজন ৫০ পাতার ২০ হাজার বই, কিন্তু অর্ডার দেওয়া হল ২৫ হাজার বইয়ের। হিসেব না করে অর্ডার দেওয়া অথবা বাড়তি কিছু পাইয়ে দেওয়া। যে কারণেই হোক, সরকারের খরচের অঙ্ক বাড়তেই থাকে। যিনি ২৫ হাজার বই ছাপার সুপারিশ করেন। তিনি জানেন না, অথবা জানলেও ইচ্ছে করে ভুলে যান, এক লক্ষ ভোটারের জন্য কত বই দরকার। অক্ষম এবং মতলব বাজেরাই আজকাল দায়িত্ব পান।

কর্মী নিয়োগের সময় পুরাতন রীতিনীতি নিয়ম কানুন সব–কিছুই বাতিল হয়ে যায়। আগে যাঁরা এনুমারেশন অথবা সেনসাসের কাজ করেছেন। তাঁদের আন্দোলনের মধ্যে ঠেলে দিয়ে নতুন কর্মী নিয়োগ করা হয়। বেছে বেছে দলের সমর্থকদের কাজ দেওয়া হয়। পক্ষপাতদুষ্ট নিয়োগের জন্য এই অফিসের অর্ধডজন কর্মচারীকে একবার সাসপেনড করা হয়েছিল। অন্য সকল কেন্দ্রে যে একই ব্যাপার ঘটে তাতে সন্দেহ নেই।

নিজস্ব প্রতিনিধি

লোকাল পারচেজ শব্দটি আইনমাফিক। বাগড়ি মার্কেট থেকে ২৫ পয়সায় কলম কিনে বিল করার সময় একটা টাকা বেশি জুড়ে দিলে কিছু বলবার থাকে না। কারণ কাজটা অত্যন্ত জরুরি। কাজটাই বড়। লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন। এই বিরাট কাজটি যিনি করেন, তিনি ইংরেজ আমলের হাজির পদবাচ্য। হাজির সাহেবের কোন কাজের সমালোচনা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। কারণ স্বয়ং কালেকটরকেও সব সময়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়।

কাগজপত্র, ডটপেন প্রভৃতি এসে গেলে শুরু হয় কিন্তু ওয়াক। এনুমারেটররা বাড়ি বাড়ি গিয়ে একুশ বছর কিংবা তার বেশি বয়েসের স্ত্রী–পুরুষের নাম ধাম এনুমারেশন প্যাডে লিখে ফেলেন। এনুমারেটরের স্বাক্ষরযুক্ত কার্বন কাপিটি বাড়ির মালিকের হাতে দিয়ে মূল কপির উপর তাঁর স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে হবে। নির্দিষ্ট এলাকায় প্রতিটি বাড়িতে হাজির হয়ে ভোটারদের মাস লিপিবদ্ধ করার কথা। পারিশ্রমিক ২৫০ লোকের নাম লিপিবদ্ধ করলে একটি ম্যানডে। অর্থাৎ ১১.৫৪ টাকা। এই কাজটি কতটা হয়েছে তা যে কেউ বাড়িতে গিয়ে খোঁজ করলেই জানতে পারেন। যাঁদের বাড়িতে এনুমারেটরের পায়ের ধুলো পড়েছে, তাঁরাও চূড়ান্ত ভোটার তালিকা দেখলে হতবাক হয়ে যাবেন। সংযোজন অথবা বিয়োজন কি ভাবে ঘটে গেছে কেউ বলতে পারেন না।

এনুমারেটরদের কাজ দেখাশোনা করেন যাঁরা তাঁদের নাম সুপারভাইসর। ১৯৮৪ অবধি সুপারভাইসর নিয়োগ করা হয়েছে কোন রকমের নিয়মকানুনের পরোয়া না করে। কয়েকজন ছিলেন যাঁরা পূর্বে ভোটার তালিকা চোখেও দেখেনি। একমাত্র যোগ্যতা ছিল পার্টি আনুগত্য। তালিকায় এত ভুল ছিল যে, একজন রাজনৈতিক নেতা সুপ্রীম কোর্টে মামলা ঠুকে দেন। তখনই নির্বাচন কমিশন ১৯৮৪–এর ভোটার তালিকা নির্ভুল করার সংকল্প নেন। স্থির হয় যে, স্থায়ী সরকারি কর্মচারী যারা এনুমারেশনের কাজ শুরু হবে। সেইমত নির্দেশ জারিও হয়। কিন্তু সরকারি কর্মচারী হিসেবে যাঁরা এলেন দেখা গেল তাঁদের পার্টি আনুগত্য আরও বেশি। হাজার হাজার ভোটারের নাম বাদ গেল। ড্রাফট পাবলিকেশন হল পুরোপুরি এলোমেলো ভাবে। ফাইনাল পাবলিকেশনের আগে নাম তালিকাভুক্ত করার জন্য আবেদনও পড়তে লাগল হাজারে হাজারে। কালেকটরেটের কয়েকজন অতি–উৎসাহী কর্মী জমাপড়া দরখাস্তের মধ্যে কিছু দরখাস্ত বাতিল করে দিলেন। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভাবে বেআইনি। এমন অধিকার কেরানিবাবুদের কেউ দেয়নি।

১৫৮ বিধানসভাকেন্দ্র বড়তলার বিধানসভার ক্ষেত্রের ভোটার কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য মামলা ঠুকে দিলেন। হাইকোর্ট তদন্তের নির্দেশ দিলেন। তদন্ত রিপোর্টে কারচুপি ধরা পড়ল। বাতিল ভোটারদের তালিকাভুক্ত করার নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্ট। রাজ্য সরকার হেয় প্রতিপন্ন হলেন, কিন্তু কারও বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হল না।

ক্যালকাটা কালেকটরেটের সঙ্গে ডি. ই. ও কিংবা ই আর ওদের অফিসের তেমন ফারাক নেই। সর্বত্রই চলছে দুর্নীতি এবং দলবাজি। □

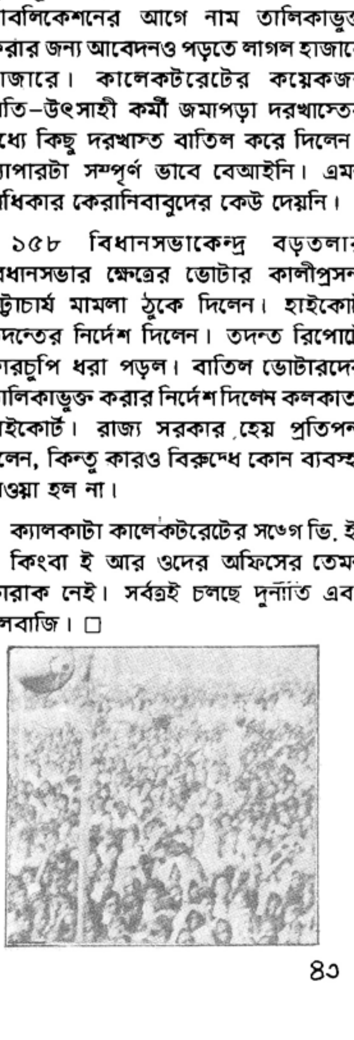

বিধিবদ্ধ রেশনিং থেকে মুক্তি চাই

বাড়িতে একটি প্রাণী চাই শুধু লাইন দেবার জন্য। সকালে মিল্ক ডিপোতে লাইন, তারপর কেরোসিনের জন্য লাইন, ইলেকট্রিসিটির বিল মেটাতে লাইন, টেলিফোনের বিলের ব্যাপারেও লাইন। সব চেয়ে বড় লাইন রেশনের দোকানে।

কাঁকর আর পোকা-মেশানো চালে যত ময়লা আর দুর্গন্ধই থাক না কেন, কিনতেই হবে। না কিনলে রেশন কার্ড বাতিল হয়ে যাবে যে। খোলা কালোবাজারে অঢেল সরেস চাল পাওয়া যাচ্ছে। আমরা কিনছিও। তবুও রেশনের চাল নিতেই হবে। গম যে কিনবেন, সেও একই ব্যাপার। পোকা-খাওয়া, নোংরা। রেশন দোকানের চিনির বেশির ভাগটাই চিনি নয়, অন্য কিছু। তেল যা দেওয়া হয়, তার সবটাই ভেজাল। এ অভিযোগ শুধু আমার আপনার নয়, মন্ত্রীরাও কবুল করেছেন—বিধানসভায়, সাংবাদিকদের কাছে।

বিশেষ প্রতিনিধি

সারা ভারতে বিধিবদ্ধ অর্থাৎ স্ট্যাটিউটরি রেশনিং শুধুমাত্র কলকাতা আর আসানসোলে। এই দুই অঞ্চলেই শুধু মানুষের খুশি মত চাল-গম কেনার অধিকার নেই। আইন মোতাবেক এখানে রেশন দোকান ছাড়া অন্য কোন জায়গা থেকে চাল কিংবা গম কেনা দন্ডনীয় অপরাধ। অন্যত্র ক্রেতারা খুশি মত বাজার কিংবা রেশন দোকান থেকে চাল-গম কিনতে পারেন।

কলকাতা আর আসানসোলের মানুষের অবাধে চাল-গম কেনার অধিকারটুকু হরণের জন্য কি বিরাট আয়োজন। রাজ্য সরকারের খাদ্য দপ্তরের বার্ষিক বাজেট চার কোটি টাকার। এর অর্ধেকের বেশি টাকা বেঁচে যেত স্ট্যাটিউটরি রেশনিং বাতিল করলে। দুটো রেশন অঞ্চলে বাইরের চাল-গমের প্রবেশ বন্ধ করার জন্য আছে বিরাট কর্ডনিং ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা কেউ মানে না, তবুও রেশনিং থাকলে নাকি রাখতেই হয়। কেন্দ্রকে এই বাবদ বছরে তিন কোটি টাকা যোগাতে হয়। রাজ্যের একটা পুরো পুলিশ ব্যাটালিয়ান এ কাজে সর্বক্ষণ ব্যস্ত। খাদ্য দপ্তরের কিছু সংখ্যক কর্মচারীও এই কাজে উৎসর্গীকৃত। রেশনিং-এর চেয়ে কর্ডনিং অনেক বড় পরিহাসের ব্যাপার। একেবারেই নাম-কা-ওয়াস্তে। কেউ মানে না। কিছু লোক করে খাচ্ছেন—এই যা।

চালের যে বিরাট কালোবাজার গড়ে উঠেছে, তা এই কর্ডনিং-এর কল্যাণেই। জল, স্থল এবং রেলপথে নিত্য যে কুইনটাল কুইনটাল চাল বেআইনিভাবে আসে এবং অবাধে যথেচ্ছ দামে বিকোয় তা এই কর্ডনিং ব্যবস্থার দৌলতেই। কর্ডনিং না থাকলে স্ট্যাটিউটরি রেশনিং থাকত না। চাল আসত অবাধে। আর সব জায়গায় যেমন আসে তেমন বিকোত দোকানে দোকানে—প্রকাশ্যে, নলচে আড়াল দিয়ে নয়। স্মাগলারদের যে ব্যাটালিয়নগুলো রেলের নিত্যযাত্রীদের জীবন দুর্বিসহ করে তোলে, সেগুলো পাততাড়ি গোটাতো।

কলকাতার যা লোকসংখ্যা, রেশন কার্ডের সংখ্যা তার থেকে অনেক বেশি। এক কোটির উপরে। এই কার্ডগুলো ছাপা, তার হিসেব পত্র রাখার জন্য খাদ্য দপ্তরের একটি অংশকে পুষতে হয়। রেশন কার্ড ছাপা হয় সব বেসরকারি প্রেসে। পয়সা খরচ করলেও রেশন কার্ড পাওয়া একটা পরীক্ষায় পাশ করার সামিল।

রেশনিং হলে চাল-গমের ব্যবসা সরকার নিজ হাতে তুলে নেন। এ হল সাধারণ মানুষের ধারণা। আসলে সরকার কিছু কর্মচারী পোষেন। তাঁদের কাজ দেখাশোনা করা। তবে কাজের চেয়ে অকাজ যে বেশি হয় তা অনেকের পরিপাটি চেহারা দেখলেই মালুম হবে। আসল কাজ যা তা ব্যবসায়ীরাই করেন। ধান সংগ্রহ, ধান ভাঙানো, পরিবহন—সবকিছুর দায়িত্ব ব্যবসায়ীদের। বিধিবদ্ধ রেশন এলাকায় যে ২৭৫০ টি রেশন দোকান আছে, তার সব কটিই বেসরকারি, ব্যবসায়ীদের।

রেশনিং প্রবর্তিত হয়েছিল চরম খাদ্য সংকটের সময়ে। প্রথম আবির্ভাব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে। ইংরেজ আমলে। তারপর, যখন এ রাজ্যে দমদম দাওয়াই-এর পাশে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ আন্দোলন চলছে, তখন। ভারতবর্ষে এখন খাদ্যের অভাব নেই। বিদেশে আমরা চাল রপ্তানি করি। পশ্চিম বাংলাও প্রায় স্বয়ং সম্পূর্ণ। সরকার সামান্য যে ঘাটতি দেখান, তা ব্যবসায়ীদের ক্ষমতা দিলে ভিন্ন রাজ্য থেকে অনায়াসেই আমদানি করা সম্ভব। তাহলে এই ব্যয়বহুল দুর্নীতিবেষ্টিত সর্বাত্মক রেশনিং কেন?

রেশনে, আংশিক অথবা পূর্ণ, যে চাল-গম দেওয়া হয় তার প্রায় সবটাই আসে কেন্দ্রীয় ভান্ডার থেকে। চলতি বছরে সর্বসাকুল্যে মাত্র এক লাখ টন চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। কুলাকদের গায়ে হাত পড়বে না। ২৬২টি চাল কল কিছু দেবে। লেভির চাল সরকারি দামে দিয়ে বাকিটা যথেচ্ছ দামে বিক্রি করবে—এই সর্তে। বাকি চালটা আসবে ডি.পি. এজেন্টদের মাধ্যমে। এঁরা চাল কেনেন খোলা বাজার থেকে। উৎপাদকদের অভাব যখন চরমে, তখন। সরকারের এইভাবে চাল সংগ্রহে ব্যবসায়ীরাই লাভবান হয়। লেভির সংগ্রহের জন্য গতবছর কেন্দ্রকে আট লাখ টাকা দিতে হয়েছে।

কেন্দ্র নাকি আমাদের সরেস চাল গম খাওয়াতে কৃতসংকল্প। সে জন্য তিন মাস অন্তর পরিকল্পনা করা হয়। সেইমত সরু চাল, মোটা ঝকঝকে শাদা গম, মোটা দানার চিনি, কারখানায় প্যাক করা ভাল রেপসিড এবং পাম অয়েল নাকি নিয়মিত পাঠানো হয়। ফি মাসে কমপক্ষে দশ হাজার টন চাল, একলক্ষ ছাব্বিশ হাজার টন গম, সাড়ে চল্লিশ হাজার টন ময়দা এবং সাড়ে চব্বিশ হাজার টন চিনি কেন্দ্র পাঠান। এসব হাওড়া স্টেশন অথবা শালিমার গুদাম থেকে রাজ্যের আড়াই শত এফ.সি.আই গুদামে পৌঁছে যাবার কথা। একাজ তদারকির জন্য এফ.সি.আই-এর সঙেগ যুক্তভাবে কাজ করার কথা খাদ্য দপ্তরের অফিসার ও ইন্‌স্পেক্টরদের। চুক্তি অনুযায়ী খাদ্য দপ্তরের নির্দেশ মেনেই এফ.সি.আই-এর এই ব্যাপারে কাজ করতে হয়। তা সত্ত্বেও পাঞ্জাব, অন্ধ্র, হরিয়ানা কিংবা মধ্যপ্রদেশ থেকে পাঠানো সরু দাদখানি চাল যখন রেশন দোকানে পৌঁছয় তার তাজ্জব রূপান্তর ঘটে যায়। বস্তা থেকে বেরিয়ে আসে নোংরা, কাঁকর মেশানো আতপ বা সেদ্ধ চাল যার দুর্গন্ধে বমি আসে আর খেলে আন্ত্রিক ব্যাধি দেখা দেবেই। রেশনিং ব্যবস্থা কি এই অখাদ্য চাল কিনতে গরিবদের বাধ্য করার জন্য?

অখাদ্য না দিয়ে রেশনিং তুলে নিন—এ দাবি এফ.সি.আই-এর সদর দপ্তরকেও ধাক্কা দিয়েছে। কেন্দ্রীয় খাদ্য সচিবকে বারে বারে আসতে হয়েছে রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রাধিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। খাদ্যসচিব পরপর জানতে চেয়েছেন, এমনটা হচ্ছে কেন? সরেস চাল কি করে অখাদ্য চালে পরিণত হচ্ছে? চিনি-গমের ক্ষেত্রেও কি করে অঘটন ঘটছে? কেন্দ্র একবার এ ব্যাপারে তদন্তের ভার দিয়েছিলেন, সি.বি.আই-কে। তাঁরা জানান, রেলরেকে আসা চাল-গম-চিনি ঠিকই সরাসরি চলে যায় খাদ্য গুদামগুলোতে। সেখান থেকে বেরিয়েও যায় ঠিকই। গোলমাল যা হবার, হয় মাঝপথে। জিঁজরাপোল, ক্রুকলিন, ওরিয়েন্ট জুট মিল, কাশীপুর, কল্যাণী, সিউড়ি, বাঁকুড়া, দুর্গাপুর, গোপালপুর, শিলিগুড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে খাদ্য গুদাম থেকে এয়ার লিফটাররা মাল নিয়ে যায় রেশন দোকানগুলোতে। সেখানেই সব-কিছুর চেহারা পাল্টে যায়। মিহি সেদ্ধ চাল

রূপান্তরিত হয় ধান, কাঁকর আর ধুলোবালি মেশানো মোটা চালে। বড় বড় দানার শাদা গম হয়ে যায় মোটা মোটা খোসার পোকাভর্তি গমে। চিনির অবস্থাও তথৈবচ।

অভিযোগের পাহাড় জমে আছে খাদ্যদপ্তর আর এফ.সি.আই-এর আঞ্চলিক অফিসগুলোতে। রাধিকাবাবু এবং তাঁর সহকারী অচিন্ত্য রায়ের কাছেও অনেক অভিযোগ গেছে। তাঁরা ভিজিলেন্স কমিশনারকে খাদ্য দপ্তরের কিছু অফিসার ও ইন্‌সপেক্টর আর এয়ার লিফটারদের উপর নজর রেখেছিলেন।

সি.বি.আই এবং ভিজিলেন্স-এর তদন্ত চলল পৃথকভাবে। এর পরেই দেখা গেল খাদ্য দপ্তরের কয়েকজন অফিসারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁরা নাকি এয়ার লিফটারদের কাছ থেকে ঘুষ নিতেন। অনুসন্ধানে প্রমানিত হয় যে, খাদ্য দপ্তরের একটি চক্রের সঙেগ ফুড কন্ট্রাক্টরদের একটা অংশের দহরম-মহরম বেড়েই যাচ্ছে। রাতারাতি বাড়ি গাড়ি এবং প্রচুর অর্থের মালিক কয়েকজন অফিসারের উপর নজর রেখে জানা গেল রকমারি তথ্য। মামলা করা হল এফ.সি.আই-এর কিছু অফিসারের বিরুদ্ধেও।

সন্দেহজনক কিছু অফিসারকে বদলি করা হল। একটা কিছু হবার আশা উজ্জ্বল হতেই দেখা গেল এফ.সি.আই-এ কাজ করেন রাজ্য সরকারের এমন দশ হাজার কর্মচারী যাঁদের বলা হয় ডেপুটেশনিস্ট, তাঁরা এফ.সি.আই-এর পুরো কর্মচারী হবার দাবিতে আন্দোলন করছেন। নতুন জটিলতার মধ্যে আসল সমস্যা ধামাচাপা পড়ে গেল।

রেশন দোকানের সংখ্যা:

সংশোধিত রেশন এলাকায়—১৬৩৪০

বিধিবদ্ধ রেশন এলাকায়—২৭৫০

রেশন কার্ডধারীর সংখ্যা:

বিধিবদ্ধ এলাকায়—এক কোটি

সংশোধিত এলাকায়—৪ কোটি ৭৪ লক্ষ

রাজ্য খাদ্য দপ্তরের বার্ষিক বাজেট—প্রায় ৪ কোটি টাকা

খাদ্য দপ্তর ফি বছর বন্টন করেন:

চাল গম—২৩ লক্ষ টন

চিনি—৩ লক্ষ টন (বছরে)

কেরোসিন—৪৫ হাজার কিলো-লিটার (মাসে)

রেপসিড তেল—এক লক্ষ টন (মাসে)

সংগ্রহ লক্ষ্য (চাল):

এবছর: এক লক্ষ টন

কেন্দ্রীয় সাহায্য—কুইনটাল প্রতি এক টাকা। গতবছর এই বাবদ কেন্দ্র দিয়েছে আট লাখ টাকা

রেশনে সেই ধান, কাঁকর, ধুলোবালি-মেশানো চাল-গমই দেওয়া হচ্ছে। রেশনে ভাল চাল-গম দিতে হলে ভিজিলেন্স, সি.বি.আই-এর উপর নজর রাখতে আরও কিছু এজেন্সীকে নিয়োগ করতে হবে। যে অবস্থা চলছে, তার সংশোধন আপাতত শিবেরও অসাধ্য। সহজ পথ হল পূর্ণ রেশনিং তুলে দেওয়া। ব্যবসায়ীদের সঙেগ প্রতিযোগিতায় নামতে হলে রেশন দোকানের মালিকদের হৃদয়ের পরিবর্তন এমনিতেই এসে যাবে।

মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু একবার কেন্দ্রের কাছে দাবি করেছিলেন, সারা দেশে নিত্য প্রয়োজনীয় সকল জিনিস রেশনে দেওয়া হোক। কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রীর সঙেগ তাঁর এ নিয়ে কথাও হয়। জ্যোতিবাবুকে সমর্থন জানিয়েছিলেন কাশ্মীর, তামিলনাড়ু এবং অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রীরাও। কেন্দ্রও "উত্তম প্রস্তাব"-টিকে স্বাগত জানিয়ে ছিলেন।

রেশন দোকানে গরিব মানুষ সস্তায় চাল, গম, চিনি, তেল, নুন, ডাল, মশলা, শাড়ি, ধুতি, জামাকাপড়, খাতা, কাগজ, ছিট কাপড় প্রভৃতি পাবে—শুনতে খুবই ভালো লাগে। পছন্দ না হলে খোলাবাজারে এইসব কেনা যাবে তো? নইলে গরিবের বাড়িতে কলকাতার রেশনের চাল-গমের মত অখাদ্য ডাল-নুন ইত্যাদিও যেতে থাকবে।

এখন যে ভাবে চলছে, তা চলতে পারে না। পূর্ণ রেশনিং ব্যবস্থাকে ত্রুটিমুক্ত করা যখন সম্ভবই নয়, তখন তাকে অক্সিজেন দিয়ে জিইয়ে রেখে লাভ কি? □

Ma-Tara Engineering Works

All Kinds of Fabrications Mechanical, Electrical Govt. Contractors & General Order Suppliers.

Specialist in **Precision Engineering Jobs & M. S. Staging & Shuttering Materials.**

13/1, Kali Prosad Banerjee Lane.

Howrah-711 101 (W.B.)

সংবাদ-সাহিত্য

প্রায় পক্ষকাল পরে গোপালদার সুদীর্ঘ পত্রাঘাত ঃ

"ভায়া,

গতকাল (১৮.১২) সকলের অলক্ষ্যে তোমাদের সম্পাদকীয় দপ্তরে গিয়েছিলাম। তুমিও টের পাওনি। তিব্বতী সাধুর কৃপায় এ ক্ষমতা পেয়েছি তা তো জানই।

এবারেও সংবাদ-সাহিত্য রচনার ব্যাপারে তোমাকে উৎসাহহীন সম্পূর্ণ হতবল দেখে দুঃখবোধ হল। নির্বাচন-সংক্রান্ত সংখ্যা দুটিতে বহু সমর্থজনের সমাবেশ হয়েছে, এই অবকাশে তুমি একটু বিশ্রাম করে বুদ্ধিমানের কাজই করেছ। একনাগাড়ে সাতটা সংখ্যায় সংবাদ-সাহিত্য লেখার দরুণ এক সংখ্যায় ক্যাজুয়াল লীভ এবং আর একটাতে আর্নড লীভ তোমার পাওনা হয়েছে। কিন্তু তার বেশি নয় এটা মনে রেখো। আপদে বিপদে তোমার পাশে সর্বদা থাকি, তুমিও যতদূর জানি আমার উপর নির্ভরশীল। দশম সংখ্যায় যথাসাধ্য তোমায় সাহায্য করছি।

এবার এক কাজ কর। আজ থেকে ঠিক আটান্ন বছর দু মাস আগের (কার্তিক ১৩৩৩) ভোট-সংখ্যা শনিবারের চিঠির প্রচ্ছদটির ছবি হুবহু এখানে ছেপে দাও। প্রায় ষাট বছর পরেও

—শনিবারের চিঠি—

কার্ত্তিক ভোট সংখ্যা ১৩৩৩

সম্পাদক—শ্রীযোগানন্দ দাস

সহঃ সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস

— নির্ব্বাচনের পর

একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য লেন্স তৈয়ারীর কারখানা ও চশমার দোকান

সিংহ বসু এণ্ড কোং

(ইণ্ডিয়ান অপ্টিক্যাল কোং লিমিটেড)

২৭৫।৩, বউবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য ৴০ এক আনা।

কিরকম লাগসই হয় তা দেখাই যাক না। আর একটা কথা। এবার সাহিত্য বিষয়ে কোনও জুয়াচোর বা ধাগড়কে গালিগালাজ করো না। কার বাবা কিংবা মামা কিংবা মেসো নির্বাচনে দাঁড়িয়েছে তা যখন জানা নেই তখন ঝুঁকি নিতে যাওয়া উচিত হবে না।

তোমাদের টেবিলে দেখলাম কিছু প্রুফ পড়ে আছে। সংশোধন করা হয়েছে কি না জানি না, একটা ভুল নজরে পড়ল – 'নির্বাচ্চন সংখ্যা'। 'চ্চ'-এর জন্যে বেশ গোলমেলে অবস্থা! সন্ধির নিয়মানুযায়ী নিঃ+বাচ্চন হলে 'বাচ্চনশূন্য' বা 'বাচ্চন নাই' দাঁড়িয়ে যায় সেটাই যে ধরা উচিত। এলাহাবাদে তাহলে কী হবে ভায়া? যিনি কম্পোজ করেছেন তিনি কি ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা? ভগবানের লীলা বোঝা দায়! বাচ্চন, সুনীল, বৈজয়ন্তীমালা ইত্যাদিরা পার্লামেন্টে অনেকগুলি জরদগবের পাশাপাশি ফুলদানির মহিমায় শোভা পাবেন সেটা মন্দ কি! এতকাল 'ফ্যনা'র একঘেয়েমি সহ্য করেছি -- এখন 'ফ্যারা'র আমদানি হোক না কেন।

*

ভায়া, এযাবৎ নিজেদের ঐতিহ্যপন্থী, রক্ষণশীল ইত্যাদি ভেবে যে আত্মপ্রসাদ লাভ করে এসেছি নানা ঘাতপ্রতিঘাতে সে বিশ্বাসের ভিত্তিমূল ক্রমে ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে আসছে এটা উপলব্ধ হচ্ছে।

বেশি দিন নয়, মাত্র ষাট-সত্তর বছর আগে পর্যন্ত ইংরেজের আওতায় থেকে আমরা যাকে খাঁটি সভ্যতা বলে মনে করতাম সেটাই যথার্থ সভ্যতা ছিল। মনুষ্যত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, নারীর সম্মান রক্ষা, শ্রমের মর্যাদাবোধ, রুচিশীল জীবনযাপন, সৎসাহিত্য ও শিল্পের প্রতি আগ্রহ, শিক্ষিত হওয়ার প্রচেষ্টা, ধর্ম ও নীতিবোধ ইত্যাদি নানা গুণে আমাদের দেশের মানুষ প্রকৃতই ভূষিত ছিল। কিন্তু মাত্র দু দশকের মধ্যে দু-দুটি বিশ্বমহাযুদ্ধ এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের পর বিপর্যস্ত ইংরেজ ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার পর থেকেই অবক্ষয়ের সূচনা হল। প্রথম দিকে ঢাক ঢোল কাঁসর ঘণ্টা ব্যাগপাইপ বিউগল্ অনেক বাজল। ইংরেজের বনেদিয়ানা এদেশ থেকে পুরোপুরি বিদায় নেওয়ার পর যে সভ্যতা ধীরে ধীরে আমাদের গ্রাস করল তা ইয়াঙ্কি নামে আখ্যাত ধনী দেশ আমেরিকার অত্যুগ্র আধুনিকতা। বীট মড হিপি টিপি প্রভৃতির প্রচন্ড ঢেউ আমাদের দেশকে, বিশেষত আমাদের যুবশক্তিকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল জাহান্নমের প্রশস্ত সড়কে সেটাও তো আমরা দেখলাম। অন্য কথার দরকার নেই -- নারীপুরুষের বেশভূষা আচার আচরণ মায় কেশবিন্যাস পর্যন্ত কোন্ স্তরে গিয়ে পৌছল তাও আমরা দর্শন করেছি।

এরই পিঠোপিঠি এসে গেল আমাদের শীর্ষদেশবিহারী সম্পূর্ণ ভিন্ন মনোবৃত্তির শ্বেত ভল্লুকের দল -- সোভিয়েত রাশিয়া যার নাম।

এরা এল কিন্তু ছদ্মবেশে। সিয়া এবং কেজিবি নামেব

অন্তরালে আত্মগোপন করে তামাম হিন্দুস্তানকে গ্রাস করে ফেলল ডলার এবং রুবল নামক দুটি মারাত্মক অস্ত্রের সহায়ে। প্রজাতন্ত্রী ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দলগুলি এদের কারুর না কারো বশীভূত হল অচিরেই। টাগ অফ ওয়ার শুরু হল ডলার এবং রুবল দুই দৈত্যের মধ্যে।

এত কথা বলার দরকার হল কারণ তোমাদের সহযোগী পত্র-পত্রিকাগুলির মধ্যে অনেকেই কুরুপান্ডবের এই দ্বৈরথ সমরে জড়িয়ে পড়েছেন। যাঁরা জড়াননি বা যাঁদের জড়ানো হয়নি তাঁরাও সুযশ বা অপযশের ভাগী হচ্ছেন। বড়রা সুনিশ্চিত সিয়া বা কেজিবি-কবলিত, ছোট কাগজের প্রায় অনেকগুলিই হয় পার্টিবিশেষের অথবা মন্ত্রীদের কারও খাসতালুকভুক্ত। এঁরা টাকা পাচ্ছেন, যে যাঁর ফাইন্যানসিয়ারের জয়গান গেয়ে চলেছেন -- খুবই সুখের কথা সন্দেহ নেই।

ভায়া চুপি চুপি একটা কথা বলি। সাপ্তাহিক কাগজ চালানো নেহাত সহজ ব্যাপার নয় তা তো এই কয়েক সপ্তাহেই বুঝেছ, খরচও সাংঘাতিক। ভেবে দেখলাম, তোমাদেরও একটা মুরুব্বি দরকার। রাশিয়া আমেরিকা ওভারবুকড, ওদের পাওয়া যাবে না। মহাচীনের প্রাচীর ভেদ করে ঢুকে পড়ো। চীনীদিদির আঁচল খুব বেশি কেউ ধরেনি, তোমরা চেষ্টা করলেই চীনের কৃপালাভে সক্ষম হবে বলেই আমার ধারণা। লেগে পড়ো ভায়া। আমি ইতিমধ্যে বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের জুতাপটি অঞ্চলে একজন মহাজ্ঞানী চৈনিক ব্যবসায়ীর সঙ্গে গোপনে কথা বলে রেখেছি। তাঁর নাম লি ফুন্ চ্যাং -- লাওৎসে কনফুসিয়াস তাও রবীন্দ্রনাথ তাঁর নখাগ্রে। তিনি চীনা বৈদেশিক দপ্তরে অবিলম্বে একটি চিঠি পাঠাতে বলেছেন। শুধু চিঠির শেষে সাহায্যপ্রার্থীর তরফে চীনা ভাষায় লেখা এই তিনটি লাইন তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী দিতে হবে। তাহলেই কার্যসিদ্ধি।

এর মানে কি দাঁড়ায় তিনি বলে দিয়েছেন, সেটাও লিখে দিলাম।

মিং চিঞ্চো ফু চিঞ্চো তোয়াং ফুয়ে সিয়াংকিং
চ্যাংসাই ডিসিন্ মাঞ্চু বাঞ্চুং চুতে চিং।
'ইন্ডি চিং ব্যাং ব্যাং।'
আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী
কাগজের ভূত ঘাড়ে বাঁচাও দিদি চীনী।
'হিন্দী চীনী ভাই ভাই।'

– গোপালদা।"

লোকমারফত প্রাপ্ত গোপালদার আরও পত্র ঃ

"ভায়া, এ জীবনে কত রহস্য, কত রোমাঞ্চের মুখোমুখিই না হলাম। তিব্বতের গুম্ফায় তন্ত্র এবং যোগাভ্যাসকালে লামা ইয়েতির কত ঘটনাই দেখতে পেয়েছি। যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ মহামারী দাঙ্গা, ভূত প্রেত শ্মশান মশান দৈব অতিপ্রাকৃত কত কি যে দেখলাম তার ইয়ত্তা নেই। মৃত ব্যক্তির সশরীরে আবির্ভাবও চোখের সামনে ঘটেছে। কিন্তু গতকাল রাত্রে [তাং ২৪.১২.১৯৮৪] যে লোমহর্ষক নাটক প্রত্যক্ষ করলাম তার তুলনা হয় না ভায়া। বলছি শোন ঃ

সারাদিন ইলেকসনের হৈ হৈ-এর মধ্যে কয়েকটি বড় বড় ভোটকেন্দ্র ঘুরে দেখে রাত্রে খুব ক্লান্তি অনুভব হল। নটার মধ্যেই খেয়ে শুয়ে পড়লাম। মধ্যরাত্রি নাগাদ ঘুমটা ভেঙে গেল। মনে হল কুঁক কুঁক করে কিসের আওয়াজ হচ্ছে আমার ঘরে। আলোটা জ্বাললাম। কোথাও কিছু নেই। ভালভাবে ঠাহর করে মনে হল ঘরের কোণে রাখা টিভিটার ভেতর থেকে আওয়াজ আসছে। কি খেয়াল হল, সুইচটা টিপে দিলাম। কুঁক কুঁক আওয়াজটা বাড়ল এবং আলোও জ্বলল। আবার কি খেয়াল হল চ্যানেলের কলটা ঘোরাতে লাগলাম। কট কট করে কটা যে ঘুরিয়েছি তা মনে নেই, আমি প্রায় সংবিৎ হারিয়ে ফেলেছিলাম। হঠাৎ একবার মানুষের ছবি এবং কথার আওয়াজ টিভিতে ভেসে উঠল। পরিষ্কার ছবি, পরিষ্কার আওয়াজ। আমার ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট টিভিটা, কি আশ্চর্য – সাত রং নয়, সহস্র বর্ণে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে। শুধু এইটুকু বুঝলাম, এটা কিভাবে উপগ্রহের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে -- পৃথিবীর বাইরের কোনও ছবি এতে ধরা পড়েছে।

দেখছিলাম, মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম। হাজার রামধনুর রং আমার চোখের সামনে খেলা করছে। যে দৃশ্য দেখছি তা পৃথিবীর কোথাও সম্ভব নয়। আমি তোমাদের গোপালদা -- কাশ্মীর থেকে সুইজারল্যান্ড, উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু, কোন জায়গায় না গেছি! কিন্তু এমনটি তো কোথাও দেখি নি।

ছবিতে যাঁদের দেখা যাচ্ছে -- দেবদুর্লভ সব মূর্তি, এ কি দেখছি! খুব বেশি সময় গেল না। ভারতবর্ষের, সমস্ত ভারতবাসীর অতিপরিচিত দুটি মুখ -- জনৈক পিতা ও তস্য কন্যার সম্পূর্ণ অবয়ব দেখতে পেলাম টিভির পর্দায়। এবারে তাঁদের কথোপকথনও শোনা যেতে লাগল।

আমি কোনমতে হাত বাড়িয়ে পাশে রাখা টেপ-রেকর্ডারটা চালু করে দিলাম।

[টিভিতে অ্যাকশন ঃ জওহরলাল চঞ্চল, বুকে লাল গোলাপ, হাতে ব্যাটন, ইন্দিরা পাশে পায়চারি করছেন, হাতে পারিজাত পুষ্প]

–বেটি, আজ হিন্দুস্তানমে তো বহুৎ লটকপটক চল্ রহা হ্যায়। দেখো দেখো, কিতনা আদমী অওর আওরৎ খাড়া হো গিয়া লাইনমে। লেকিন, রাজুকো হাল কেয়া হোগা ইসি চিন্তামে --

–পিতাজি, মেরে বাচ্চোঁকে লিয়ে আপ ঘাবড়াইয়ে মৎ। হম্ যব ইধার চলা আয়া উসি টাইমসে মেরা মালুম হ্যায় কি রাজু ঠিকসে এ গাড্ডা পার হো যায়েগা। হম নেহি রহনেসে রাজু পুরা ফায়দা উঠানে সকতা। দেখিয়ে পিতাজি, বাচ্চোঁকি ক্যাম্পকা সামনে কেতনা আদমী সামিল হুয়া। এ সভি ভোটার হ্যায় মেরা কংগ্রেস কি সাইডওয়ালা।

–বেটি, হম ঘাবড়াতে নেহি। যবতক দো অরুণ, এক পরণব, এক গণি রাজুকো সাথমে হ্যায় তবতক কোই ঘাবড়ানেকো বাত আতে নেহি। লেকিন, ছোটি বহুকো লিয়ে মেরা প্রেস্টিজ তো পুরা ডাউন হো গিয়া।

–পিতাজি, ইয়ে আপ সচ বোলা। পরনব কি এক বাত অওর

গণিকো এক ল্যাথমে বিশ হাজার আদমীকা ফর্মা পুরা বদল হো যাতা। ইয়াদ রাখিয়ে পিতাজি, আপ আভি বৈঠা- হ্যায় নন্দনকাননমে, হিঁয়া প্রেস্টিজকা বাত কেইসে আতা? তেত্তিশ ক্রোড় দেওতা তো বগলমেই হ্যায়, এ দিল্লি নেহি পিতাজি। লেকিন ম্যায় কালসে দেখা কি লেড়কা কুছ খাতা নেহি, রাতমে উসকো নিদ নেহি, ভোটমে কেঁয়া হোগা এহি শোচতে শোচতে বেচারা রাজুকো...

–কিঁউ, হরি কাঁহা হ্যায়, উয়ো কি রাজুকো পাস নেহি? খানা শোনা দেখ্‌নে কো লিয়ে তো হরিই সব কুছ হ্যায় --

–পিতাজি, হরিকো বাত ক্যায়সে বোল রঁহে আপনে?

[টিভিতে অ্যাকশন ঃ জওহরলাল সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হয়ে এক লম্ফে পারিজাত বৃক্ষের একটি নুয়ে পড়া ডাল ধরে]

–ভাইয়ো, অওর বহিনো, আজ হিন্দুস্তানকি সামনে যো সবসে বড়া সংকট আয়া...

[টিভিতে অ্যাকশন ঃ ইন্দিরা সবলে পিতা জওহরলালের হাত ধরে টেনে পারিজাতের শাখাটিকে মুক্ত করলেন।]

–পিতাজি, পরশো রোজ শচীমায়ী আকে আপকো গালি দিয়া, ইয়াদ নেহি? ইয়ে পারিজাত বৃক্ষকে লিয়ে ইন্দরবাবা অউর শচীমায়ীকো জান কবুল। তব্‌ভি আপ ওহি ডাল পাকড়তা। চলিয়ে, আপ ঘরমে চলিয়ে -- খানা তৈয়ার।

[টিভিতে অ্যাকশন ঃ জওহরলাল যেতে চাইছেন না। ইন্দিরা পুশ্ করছেন। এমন সময় এঁদের গা ঘেঁষেই বীণা বাজাতে বাজাতে একজন শ্মশ্রুগুম্ফসমন্বিত ঋষি পার হ'য়ে যাবার সময় পিতা পুত্রীর দিকে একটু তির্যক হাসির টুকরো ছুঁড়ে দিয়ে গেলেন। ইনি শ্রীনারদ বলেই মনে হল।]

–বেটি, ছোটে সাহেব ঘরমে হ্যায় কি উর্বশী রম্ভাকো পাস গিয়া, দেখো তো। মেনকাকো তো ছোড়নাই পড়া উস্‌কো।

–পিতাজি, ও লাঞ্চকো বাদ ডেলি ইন্দ্রবাবাকো লেড়কা জয়ন্তকো সাথ ইধার উধার ঘুমতা হ্যায়। আভি হিঁয়া আঁ যায়েগা।

[টিভিতে অ্যাকশন ঃ সঞ্জয়ের প্রবেশ, শরীর সুস্থ নয়।]

–মায়ি, তুম তো বিশতিশটো গোলি খাকে আভি ফাস্‌কিলাস খাড়া হ্যায়, ম্যায়নে তো বানারসমে তিনগোলি খাকে মর যাতা থা। আভিতক শিরমে দরদ্ হ্যায়।

–কোন্ গোলি মারা বেটা তুমকো বানারসমে, কোই সমাচার তো মুঝে মিলা নেহি!

–নেহি মা, উয়ো বন্দুককা গোলি নেহি, তিন ভাং গোলিকা সরবৎ ম্যায় পিয়া থা। ছোড়িয়ে ও বাত, মানেকাকা কেয়া হাল হোগা...

[টিভিতে অ্যাকশন ঃ জওহরলালের ক্রোধ বৃদ্ধি পাচ্ছে -- একসময় বিস্ফোরণ ঘটল।]

–যাও বাচ্চা, আপনা ঘরমে যাও। আভি চলা যাও, ফালতু বাত মাত বোলো।

[টিভিতে অ্যাকশন ঃ সঞ্জয়ের সলজ্জে প্রস্থান]

–ইন্দু, যো কুছ হাম দেখ রহেঁ, মালুম হোতা কি রাজু জরুর জিতেগা।

–পিতাজি, এ থোড়ি বাত হ্যায়, হামারা কংগ্রেসভি সব পার্টিকো লেংথমে মারকে চলা আয়েগা। চলিয়ে, খানা তৈয়ার হ্যায়।

* * *

বিস্ময়-বিমূঢ় আমার চোখের সামনে অতঃপর টিভি নিস্তব্ধ হল, রামধনু রং মিলিয়ে গেল। টেপ থেকে পিতাপুত্রীর কথোপকথন ভাষায় লিখতে গিয়ে হিন্দী ঠিক ভাল বুঝি না বলে কিছু ত্রুটি থেকে গেছে বোধহয়। অ্যাকশনের ব্যাপারটা পুরোপুরি স্মৃতি-নির্ভর হলেও নির্ভুল আছে বলে মনে করছি। তবে খটকা যেটা মনে লেগেছিল তাও এই চিঠি পাঠাবার আগে উপগ্রহ-বিশেষজ্ঞের কাছে গিয়ে পরিষ্কার বুঝে নিয়েছি। দিনের বেলায় যে ঘটনা ঘটছে তা রাত্রে দেখছি কি করে?

বিশেষজ্ঞের মতে উপগ্রহের কাছে ছবিটা ঠিক সময়েই ধরা পড়েছে, কিন্তু ডেলিভারি যন্ত্রে গোলমাল থাকায় তখনই ছবিটা ছাড়তে পারে নি। যন্ত্র আপনিই ঠিক হয়ে মাঝরাতে পুরো পিকচার ও সাউন্ড রিলিজ হয়ে গেছে।

সবই বরাতজোর ভায়া। গোপালদা।"□

শনিবারের চিঠি : নিয়মাবলী

গ্রাহকদের জন্য :

- শনিবারের চিঠির চাঁদার হার সডাক বার্ষিক একশো টাকা, ষাণ্মাসিক পঞ্চাশ টাকা, ত্রৈমাসিক পঁচিশ টাকা।
- চাঁদা নগদে, মনি-অর্ডারে, ড্রাফ্‌টে বা কলকাতার ব্যাংক চেক মারফত দেওয়া চলবে।
- যে কোনও সংখ্যা থেকে গ্রাহক হওয়া যাবে।
- ভি. পি. তে পত্রিকা পাঠানো হয় না।
- অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য সাক্ষাতে বা চিঠি লিখে জানালে বিবেচনা করা হবে।

এজেন্টদের জন্য :

- কলকাতার বাইরে যে কোনও জায়গায় এজেন্সি দিতে আমরা ইচ্ছুক।
- এজেন্টরা চিঠি লিখলে আমাদের ছাপানো নিয়মাবলী পাঠানো হবে।

লেখকদের জন্য :

- অমনোনীত রচনা ফেরত পেতে হলে সংগে উপযুক্ত ডাকটিকিট দেবেন।
- রচনা সম্পর্কে মতামত জানতে হলে অন্ততঃ তিন মাস অপেক্ষা করতে হবে।

বিবাহযোগ্য পাত্র–পাত্রীর অভিভাবকদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ করিয়ে দেয়

তথ্যকেন্দ্র

১০, গভর্নমেন্ট প্লেস ইস্ট (রাজভবনের সামনে) কলি–১ ফোনঃ ২৩–৪৪৬৭

সম্পাদিকা
মঞ্জুশ্রী তালুকদার এম.এ.
উপদেষ্টা
অরুণ চট্টোপাধ্যায়
এম. এসসি., পি এইচ. ডি.

তথ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে
বিবাহিত পাত্র–পাত্রীর সংখ্যা

জুলাই ১৯৮২	৮৯৪
জুলাই ১৯৮৩	৯৪৮
জুলাই ১৯৮৪	৯৭২

নিয়মাবলী

১। তথ্যকেন্দ্রের নির্দিষ্ট ফর্মে পাত্র–পাত্রীর সঠিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হবে।

তালিকাভুক্তির জন্য পাঁচ টাকা, সার্ভিস চার্জ মাসে দশ টাকা ও বিবাহ স্থির হলে ফাইনালাইজেশন ফি দশ টাকা অর্থাৎ প্রথম মাসে মোট পনের টাকা, পরের মাস থেকে দশ টাকা ও বিবাহ স্থির হলে দশ টাকা দিতে হবে।

৩। রেজিস্ট্রেশনের এক বৎসরের মধ্যে বিবাহ স্থির না হলে পরবর্তী এক বছর বিনা ব্যয়ে তথ্যকেন্দ্রের সার্ভিস পাবেন।

* বিশেষ ক্ষেত্রেExclusive Service এর ব্যবস্থা করা হয়

**পাত্র–পাত্রীর নির্বাচনের কাজ বিজ্ঞানসম্মতভাবে ত্বরান্বিত করার Computer Service এর ব্যবস্থা আছে

কয়েকটি মতামত

"সদস্যের সংখ্যা প্রায় বাইশ হাজার । যন্ত্রজ্যোতিষী (Computer) এক মিনিটেরও কম সময়ে মনে মনে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ কষে জানিয়ে দেবেন কোন্ পাত্রের উপযুক্ত কোন্ পাত্রী আর কোন্ পাত্রীর উচিত কোন্ পাত্রকে বরমাল্যে অভিষিক্ত করা।"

–আনন্দবাজার

"...The number of wedding under the agency's auspices since June 1972 encourages optimism. From 102 that month the figure has shot up to 408 last January. Bless the bride— and the agency"

—Statesman.

SANIBARER CHITHI □ Vol. 1, No. 10 □ DECEMBER 29 □ Regn. No. 42168/84 □ Rs. 2.00

CHALLENGE IN CONSTRUCTION

CENTRAL ENGINEERING SYNDICATE
(An Undertaking of New Central Group Engineering Pvt. Ltd.)

CENTRAL CONCRETE & ALLIED PRODUCTS (P) LTD
Registered Office—8, Camac Street, 3rd floor, Calcutta-700 017
Gram : CENTPILES, Telex : CENT IN CA-021-2331
Phones : 44-0090, 43-4262, 43-1521, 43-1554

WEST BENGAL DECLARATION NO. 202/84